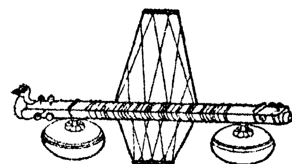
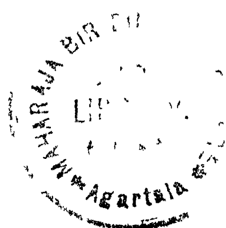


মেঘরাগ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়





প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৬৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ

আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত

৩/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদশিল্পী

গণেশ বসু

মুদ্রক

শশী প্রেস

৪৫, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

দাম আড়াই টাকা

রণজিৎকুমার সেন
বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

উপনিবেশ, শিলালিপি, অসিধারা, তিমিরতীর্থ, স্বর্ণসীতা, সূর্যসারথী, একতলা, সঞ্চারিণী, বৈতালিক, নীলদিগন্ত, পদ-সঞ্চার, বাংলা গল্প-বিচিত্রা, সাহিত্যে ছোটগল্প।

এক

কাছাকাছির মানুষ যারা, তারা শুনলেই আশ্চর্য হয়।

—বলেন কি, আপনি ছাউনি-হিলে থাকেন!

—কেন ক্ষতিটা কী?—পালটা প্রশ্ন করেন কৌশিক ঘোষ।

—ক্ষতি কী! আরে ওখানে যে রাতদিন কুয়াশা আর মেঘ, মেঘ আর কুয়াশা! সাতদিনে একবার সূর্যের মুখ দেখা যায় কি না সন্দেহ। মন হাঁপিয়ে ওঠে না?

কৌশিক ঘোষ ধীরে-সুস্থে একটা বর্মা চুরুট ধরান। তারপর ধীরে-সুস্থেই জবাব দেন, না—কিছুমাত্রও নয়।

—আর ঘন-জঙ্গল।—যারা এতেও কৌশিক ঘোষকে বিচলিত করতে পারে না, তারা আরো ভয়াবহ বর্ণনার সাহায্যে কৌশিক ঘোষকে ভীত করবার চেষ্টা করে: কালো কালো পাইনের ছায়ায় চারদিক অন্ধকার। ভূতুড়ে চেহারার পুরোনো বাড়ীগুলো রাতের বেলায় যেন থম থম করে; ভুট্টা পাকবার সময় নেমে আসে ভালুক—

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌশিক ঘোষ জবাব দেন: বলে যান।

তার সরলার্থ এই পর্যন্তই যথেষ্ট, এইবারে থামুন। তারা থেমেও যায়। তারপরই নতুন উদ্যমে শুরু করে: কলকাতা থেকে চেঞ্জে এসেছেন—দু-চারদিন মেঘ-জঙ্গল বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু ক'দিন পরেই মনে হবে দম আটকে আসছে—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার রাস্তা খুঁজবেন তখন। ও-সব রোমান্স্ যে তখন কোথায় যাবে—খুঁজেও পাবেন না।

নিজের শাদা চুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কৌশিক ঘোষ: আমার মাথার দিকে তাকিয়ে কি এই কথাই মনে হচ্ছে যে এখনো রোম্যান্টিক্ হওয়ার মতো বয়েস আছে আমার? তাছাড়া অনেকক্ষণ

ধরে অনেক কথাই তো বলেছেন আপনারা—এবার অমার কথাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিই। আমি ছাউনি-হিলে চেঞ্জার বটে—কিন্তু সে আজ পাঁচ বছর ধরে।

—পাঁচ বছর !

বিস্ময়ের একটা সমবেত ঐকতান শোনা যায়।

—পুরো পাঁচ বছর, দু-একমাস বেশিই হতে পারে বরং। আর বিশ্বাস করুন—কখনো-সখনো দু-চার ঘণ্টার জন্যে দার্জিলিং যাওয়া ছাড়া ছাউনি-হিল থেকে আমি নড়িনি। এর মধ্যে শীতকালে স্নো পড়তে দেখেছি একবার—একবার বর্ষায় রাস্তা গেল ভেঙে, তখন প্রায় দ্বীপে বাস করেছি, তিনদিন খাবার জোটেনি, এমন কি এক-টুকরো শুকনো পাঁউরুটিও নয়। তবু ছাউনি-হিলের পাথর কামড়েই পড়ে আছি—পড়েও থাকব—যতদিন না এ-পারের পাট একেবারে সম্পূর্ণ চুকে যায়।

শ্রোতারা এইবারে নীরব।

উৎসাহিত হয়ে কৌশিক ঘোষ বলতে থাকেন: মাত্র চার হাজার টাকায় পাইন-বনের মধ্যে একটা বাংলো যা কিনেছি—সত্যি বলতে কি, ডিভাইন! দিব্যি আছি মশাই। একজন কুক্-কাম-সার্ভেন্ট; কুকুর ডেভি, বেবি আর আমি। টাটকা মাখন পাই মশাই, আপনাদের দার্জিলিং-এর কেভেণ্টার লাগে না তার কাছে। নিজে মুরগী পুষেছি—লেগ্ হর্ণ, রোড্ স্টার।

তা তাড়া শাক-সব্জী? যা চান। বাঁধা-কপি, বিন, গাজর, লেটুস, স্যালাড, রাইশাক—হোয়াট্ নট্? আপনাদের সকলকে নেমন্তন্ন করছি—চলে আসুন না দিন কয়েকের জন্যে। দেখবেন, শরীর মন দুই-ই বদলে গেছে একেবারে।

এর পরে শ্রোতারা আর কথা বাড়ায় না। খাঁটি মাখন, তাজা সব্জী—সবই মিলতে পারে ছাউনি-হিলে। সে-লোভে সাতদিন কি দশদিন নয় থাকাও গেল ওখানে। কিন্তু তারপর? ওই ধোঁয়াটে আকাশটা যেন বুকের ওপরে চেপে বসতে চায়—

সাতদিন ধরে একটানা ক্লান্তিকর বৃষ্টি যেন আত্মহত্যা করার প্রেরণা দিতে থাকে। রাত্রে নিথর জঙ্গলগুলোর দিকে তাকালে সমস্ত লোমকূপগুলো শিউরে শিউরে উঠতে থাকে—মনে হয় প্রকৃতির অন্ধ-আদিম একটা হিংস্রতা ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে—রাত আরো গভীর হলে শেক্সপীয়ারের সচল অরণ্যের মতো এগিয়ে এসে মানুষের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে!

পাঁচ বছর! পাঁচ বছর ওখানে যে পড়ে থাকতে পারে সে হয় অতি মানব, নইলে পাগল। আর তা নইলে কোনো ক্রিমিন্যাল্—ফাঁসীর কাঠগড়া এড়াবার জন্মে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিয়েছে ওখানে।

কিন্তু তাদের ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কৌশিক ঘোষ উঠে দাঁড়ান।

—আচ্ছা, আপনারা তবে বসুন, আমি এগোই। কয়েকটা জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে বাস-স্ট্যাণ্ডে। আমাদের বাস আবার চারটের মধ্যেই ছাড়ে কিনা। মেল নিয়ে যায়।

শ্রোতারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

একজন বলে, নিশ্চয় জিওলজিস্ট্—বুঝলেন! ওদের নানা ধরণের বাতিক থাকে। আর সত্যি বলতে কি, ও নেশা যার ধরেছে মশাই, তার আর নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলে—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর! নুড়ির পরে নুড়ি ঘাঁটছে, ঘর-দুয়োর ভর্তি করে ফেলেছে পাথরে, খালি ভাবছে এই বুঝি হাতের মুঠোর ভেতর একটা দুর্মূল্য কিছু পেয়ে গেলাম। আর হিমালয়ও তো মশাই একেবারে আন-এক্সপ্লোর্ড্ বলতে গেলে। কত ঐশ্বর্য ওর ভাণ্ডারে আছে—কে তার সন্ধান রাখে! আজ ওকে ঠাট্টা করছেন, একদিন হয়তো এমন কতগুলো রেয়ার-স্টোন আবিষ্কার করে বসবে, যার ফলে রাতারাতি লাখোপতি। বিনা মতলবে কেউ কি আর ছাউনি-হিলে পড়ে থাকে?

আর একজন বলে, থামো হে, থামো। জিওলজিস্ট্ হলে

চেহারা অন্য রকম হত !—যেন জিওলজিস্টের একটা বিশেষ ধরণের চেহারা আছে, আর সে চেহারাটা তার একান্ত করে চেনা, এম্‌নি অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলতে থাকে : তা ছাড়া ছাউনি-হিলে তো দামী দামী পাথর—একেবারে হাঁ করে বসে আছে ! ব্যাপার তা নয়, লোকটা ধার্মিক। যোগ-টোগ সাধনা করে।

—যোগ-সাধনা ?—তৃতীয় জন সবিস্ময়ে হাঁ করে : যোগ-সাধনা করলে চুরুট খাবে কেন, হুঁকো টানবে। উঁচু-দরের যোগী হলে হয়তো গাঁজার কলকে থাকবে সঙ্গে।

—আচ্ছা থিয়োরী তো আপনার !—অপর ভদ্রলোক কুপিত হন : যোগেরও ইভলিউশন হচ্ছে মশাই। যত রিটায়ার্ড আই-সি-এস্ ব্যারিস্টার আজকাল 'ইয়োগ'-চর্চা করছেন। বুড়ো বয়সে যখন বিলিতী ওষুধে আর ধরছে না, তখন ওঁরা শুরু করেছেন যোগ-চর্চা, শীর্ষাসন-ভুজঙ্গাসন আর শবাসন করে ক্ষিদে বাড়াতে চাইছেন। তাঁদের মুখে তো এক-একটা দেড় গজ লম্বা পাইপ দেখতে পাই।

—বাজে কথা রাখুন মশাই। ও যোগ-টোগ কিছু নয়। স্রেফ্ পাগলের খেয়াল। কিছুমাত্র স্যানিটি থাকলে কেউ ওখানে পড়ে থাকতে পারে ? এবং পুরো পাঁচ পাঁচটি বছর ?

ছাউনি-হিলে ফেরবার পথে বাসে বসেও ঠিক এই কথাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন কৌশিক ঘোষ। কী অদ্ভুত অবাস্তব কল্পনা নিয়ে এই পাঁচটা বছর তাঁর কেটে গেল ! কি পেলেন তিনি —কীই বা পেতে চান ?

বাসে একমাত্র বাঙালী-যাত্রী তিনি—বাকী সব ক'জন নেপালী আর ভুটানী। নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনা করছে তারা, টুকরো টুকরো তাঁর কানে আসছে, অথচ সবটা মিলিয়ে কোন সম্পূর্ণ অর্থ তিনি দাঁড় করাতে পারছেন না। পুরু ওভারকোটের আবরণে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে নিয়ে যেন আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করে বসে আছেন কৌশিক ঘোষ।

দার্জিলিঙ থেকে ঘুমের মেঘরাজ্যে এসেছে গাড়ী—থেমেছে কয়েক মিনিটের জন্যে। সহজ অনাড়ম্বর জীবন চারদিকে। গলায় কাচের মালা, নাকে ফুল পাহাড়ী-মেয়ে বসেছে সব্‌জীর দোকান সাজিয়ে—কয়েকটা কপি, কিছু স্কোয়াশ, দুটি আলু, সামান্য এক-গোছা রাই-শাক আর কাঁচা-লঙ্কা। ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছে মুরগী। কয়েকজন ভুটিয়া বসেছে একটা চায়ের দোকানে—চা-খাওয়া চলছে কাঁসার গ্লাসে। এ-পাশে একজন আধ-বুড়ো স্যাকরা এক-মনে নীচু হয়ে কাজ করছে, ঠুক ঠুক আওয়াজ উঠছে হাতের ছোট বাটালি থেকে—একটা রূপোর হাঁসুলীতে কী সব খোদাই করে চলেছে বুড়ো। বাসের শব্দে শুধু একবারের জন্মে তাকিয়ে দেখল। মাথার গোল-টুপিটা জরাজীর্ণ, গায়ের কোটটা কতকাল আগে সস্তায় কিনেছিল কে জানে। ঘোলাটে লাল চোখ ক্লান্তিতে অবসন্ন —সংসারে ওর কি কোনো অবলম্বন নেই যে এই বয়সে ওকে সাহায্য করতে পারে ?

অবলম্বন ! কৌশিক ঘোষ চোখ বুজলেন। ওর মধ্যে নিজেরও প্রতিফলন কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছেন বই কি তিনি। আজ নিজেও তিনি একা—সম্পূর্ণভাবেই একা। স্ত্রী নেই, ছেলে বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়েছে অনেক দিন, এক মেয়ে বিয়ে করেছে এক মাদ্রাজী ক্রীশ্চানকে আর—

আর ছোট মেয়ে রুচি।

বছরে কয়েক মাস রুচি এসে কাছে থাকে—জীবনের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে ওইটুকুই যা বন্ধন কৌশিক ঘোষের। নইলে তো পৃথিবীর কাছ থেকে একেবারে মুছে গেছেন তিনি—সেই আর্ণল্ড্ বেনেটের 'বেরিড্ অ্যালাইভ' এর গল্পের মতো। একজন কৌশিক ঘোষ একদা বর্মায় থাকতেন, রেঙ্গুন-মান্দালয়-পেগুর বাঙালী সমাজকে জমিয়ে রাখতেন উদার আহারের নিমন্ত্রণে, বসাতেন গানের আসর আর জমা নিতেন সেগুন বন—সে মানুষ হারিয়ে গেছেন।

কেন এমন করে কলকাতার কাছ থেকে সরে এলেন কৌশিক

ঘোষ? কেন সইতে পারলেন না? কিসের প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত এসে বাসা বাঁধলেন ছাউনি-হিলের এই কুয়াশাঘন নির্জনতায়? কিসের জন্যে দু'ঘণ্টা দার্জিলিঙে গেলেও ক্লান্তি অনুভব করেন তিনি?

সে কথা—

বাসের ভেঁপু বাজল, যে-সব যাত্রী চা খেতে নেমে গিয়েছিল একে একে উঠে এল তারা। শুধু ড্রাইভারই এখনো আসেনি। একটি অল্প-বয়েসী নেপালিনীর পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টেনে চলেছে। ড্রাইভারের দোষ নেই, মেয়েটির মুখখানা সুন্দর, হাসিটি আরো সুন্দর। ভারী চমৎকার টোল খাচ্ছে পাকা আপেলের মতো গোলাপী গালদুটোতে। কৌশিক ঘোষের বুকের ভেতরটা দুলতে লাগল অল্প-অল্প।

আবার হর্ণ বাজল। কণ্ডাক্টাব অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

যাত্রীদের একজন গলা বাড়িয়ে নেপালী-ভাষায় ডাকল: আজকের মতো চলে এসো হে বীর বাহাদুর। একদিনেই সব কথা শেষ করে ফেললে যে! কালও তো আবার বলবার আছে।

পানওয়ালী মেয়েটি নিঃসঙ্কোচ গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল্। ওরা এত সহজে লজ্জা পায় না।

ড্রাইভার বীর বাহাদুর ফিরে তাকালো। চোখে উদ্ধত দৃষ্টি।

কণ্ডাক্টার বললে,. আর দেরী কোরোনা—মেলের দেরী হয়ে যাচ্ছে। ডাকবাবু রাগারাগি করবে। খবরের কাগজের জন্যে ডাকঘরে সব হত্যা দিয়ে বসে আছে এতক্ষণে।

—চুলোয় যাক্ খবরের কাগজ—বিড় বিড় করে বকল বীর বাহাদুর। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার সৌখিন উলটো চুল-গুলোকে ফেলে দিলে পেছন দিকে। তারপর পকেট থেকে নীল-গগলস্‌টা বার করে চোখে পরে নিয়ে তড়াক্ করে উঠে বসল বাসে। গাড়ী ছাড়ল।

একদিকে পাহাড়ের খাড়াই—অন্যদিকে অতল-স্পর্শ খাদ। তারও অনেক নীচে রংপু নদীর ক্ষীণ ধারাটা চোখে পড়ে কি পড়ে না।

আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে কখনো পাইন বনের ছায়ার তলায় তলায় কখনো বা চায়ের বাগান পাশে রেখে বাস এগিয়ে চলল।

বর্ষা হয়ে গেছে গত তিন দিন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কৌশিক ঘোষ। পাহাড়ের বুক চিরে এদিক-ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝর্ণা, পথের ওপর ছোট-বড় পাথর নামিয়ে দিয়েছে কোথাও কোথাও। দূরে-দূরের ঝর্ণাগুলোকে আশ্চর্য উজ্জ্বল আর শুভ্র বলে মনে হচ্ছে। হিমালয় দেবতাত্মা নয়—দেবতাও নয়, সে-যেন স্বর্গের কামধেনু। তার হাজার হাজার স্তনবৃন্ত থেকে ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ছে দুধের-ধারা: উর্ধ্বমুখী পৃথিবী গো-বৎসের মতো তৃষিত হয়ে তাই পান করে চলেছে। উপমাটা নিজের কাছেই ভারী ভালো লাগল কৌশিক ঘোষের।

পকেট থেকে আর একটা চুরুট বের করে ধরালেন তিনি। এই পথ দিয়ে কতদিন তিনি যাতায়াত করেছেন, এর প্রত্যেকটি বাঁক তাঁর চেনা, চোখ বুজে বসে থেকেও বলে দিতে পারেন এই মুহূর্তে কত ফার্লঙের হিসেব লেখা আছে মাইল-পোস্টের গায়ে। কিন্তু চেনা হয়েও সব যেন চেনা হয় না। এই পাহাড়—এই অরণ্য, এই পথ—এরা যেন তাঁর কাছে চিরদিন কোনো এক অস্পষ্ট কাব্যের পাণ্ডুলিপি। প্রত্যেক দিনই নতুন করে একটা অর্থ তিনি আবিষ্কার করেন, কিন্তু কোন্‌টা যে তার সত্য অর্থ, আজ পর্যন্ত সেটা তাঁর জানা হল না!

সমুদ্রের সঙ্গে কৌশিক ঘোষের পরিচয় বহুকালের। প্রথম যৌবনে যেবার রেঙ্গুন পাড়ি দিয়েছিলেন—সেই থেকেই। কিন্তু সমুদ্রকে তাঁর ভালো লাগে না। তার সকাল-সন্ধ্যা রাত্রি-দিনের রূপ তিন দিনের মধ্যেই চেনা হয়ে যায়—কোথাও আর বৈচিত্র্য থাকে না কিছুমাত্র। সবটা মিলে সমুদ্র কেমন জান্তব—একটা অন্ধ-চঞ্চলতা—নিরবচ্ছিন্ন উতরোল চীৎকার। যে মনীষী বলেছিলেন সারাজীবন সমুদ্র দেখেই তিনি নিমগ্নচিত্তে কাটিয়ে দিতে পারেন

কৌশিক ঘোষ তাঁর সঙ্গে একমত নন। সমুদ্র আর সাহারা—দুই-ই এক।

কিন্তু ছাখো পাহাড়কে। কী আশ্চর্য উদার—কী মহিমান্বিত। স্তরে-স্তরে থরে-থরে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। কত বিচিত্র-বর্ণের ফুল ফোটায়, কত অপরূপ অরণ্যে ছায়া-নীল হয়ে থাকে, কত ঝর্ণায় তার অফুরন্ত গানের পালা। ঋতুতে ঋতুতে রূপ বদলায়। কখনো ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো পাইনের পাতা—তারপরেই হয়তো তুষার ঝরানোর পালা। হিমালয়ের দিকে তাকালেই যেন তন্ময় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে কৌশিক ঘোষের। মনে হয়ঃ জীবনে যা পাওয়া গেল না, এইখানেই তা নিঃশব্দ পুঞ্জিত হয়ে আছে কোথাও; যে পরম উপলব্ধিকে বারে বারে খুঁজে বেড়িয়েছেন সারা জীবন ধরে, তা সঞ্চিত আছে এইখানেই। অপেক্ষা করতে হবে—খুঁজে নিতে হবে।

তারই জন্যে এই পাঁচ বছর কাটল এখানে। আরও কত দিন কাটবে? ষাট বছর বয়স হয়ে গেল, আর কতকাল চলবে এই প্রতীক্ষার পালা? পাহাড়ের বুক থেকে এক মুঠো কুয়াশার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কৌশিক ঘোষ কি পাবেন সেই পরমাশ্চর্যের সন্ধান?

গাড়ী জঙ্গলের পথ ধরল। দু পাশে এখন নিবিড় গম্ভীর পাইনের অরণ্য। হঠাৎ এই জঙ্গলটাকে কেমন প্যাগান যুগের একটা প্রকাণ্ড মন্দির বলে মনে হয়। এ যেন কোনো গ্রীক সম্রাটের কীর্তি। সারি সারি গাছের গুঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় স্তম্ভের মতো—যতদূর চোখ চলে নিবিড় থেকে নিবিড়তর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেছে তারা; এই শূন্য বিশাল মন্দিরে আজ আর কেউ আলো জ্বালে না, যজ্ঞের আগুন জ্বলে না বেদীর উপর, পুরোহিতের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না। অতীতের কোনো বিরাট শবাধার একটা। তবু এমন হতে পারেঃ কোনো এক নিথর-রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এর ভেতর থেকে বেজে উঠতে পারে

কোনো অতিলৌকিক কণ্ঠস্বর—দূরে কাছে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় কেঁপে উঠতে পারে বিশাল ঘণ্টার ধ্বনি—বিরাট ধূপাধার থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ সুরভিত ধোঁয়া উঠে আকীর্ণ করে ফেলতে পারে এই আকাশকে—

গাড়ী থামল। একদল নেপালী মেয়ে পাথর ভাঙছে সামনে। রাস্তা সারাই হচ্ছে।

কৌশিক ঘোষ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মেয়েদের মুখের ওপর। স্বাস্থ্য আর সরলতা। ওরা কি কিছু জানে, কিছু কি টের পায়? ওদের কি মনে পড়ে কোনদিন ডায়োনিসাসের মন্দিরে ওরাই সুরাপাত্র বহন করত? হিমালয়ের মর্মচারী আত্মার ছোঁয়াচ ওদের জীবনে কখনো কি নেমে আসে? ওরা কি কখনো ভাবে—

আবার এক ঝলক হাসির অওয়াজ। কে যেন একটা রসিকতা করছে। মেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ছে। কী সহজেই হাসতে পারে। ঝর্ণার মতো অবারিত অকুণ্ঠ।

গাড়ী আবার নড়ল। আর একটা বাঁক ঘুরে এসে দাঁড়াল একটা গ্রামের কাছে। অধিকাংশ যাত্রী নেমে গেল এখানেই। এই গ্রাম থেকেই তারা সকালে ছানা আর মাখন বেচতে যায় দার্জিলিঙের বাজারে, ফিরে আসে সন্ধ্যার বাসে।

এর পরে আর তিন মাইল রাস্তা, তার পরেই ছাউনি-হিল। গ্রাম নয়—গ্রামে সুখ-দুঃখ মন্দ ভালো নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ জীবন নেই তার। সে সহর নয়—ইতস্তত ছড়ানো বাড়ীগুলোয় শূন্যতার সাধনা। এক আশ্চর্য জগৎ ছাউনি-হিল। একটা অতীত তার ছিল—তার কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। একটা ভবিষ্যৎ তার হতে পারত—কিন্তু তাও আর গড়ে উঠল না। প্রায়-নিরর্থক বর্তমানের মধ্যেই সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী সে পাবে—কেমন করেই বা পাবে, সে উত্তর তার জানা নেই। কৌশিক ঘোষেরও না।

দুই

তবু একটি পোস্ট্অফিস আছে ছাউনি-হিলে। টেলিগ্রাম নেই—কিন্তু ট্রাঙ্ক টেলিফোনের ব্যবস্থা রয়েছে একটা। আশ-পাশের চা-বাগান থেকে দু-একটা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কখনো কখনো হয়, তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় কিছু পোস্ট্কার্ড বিক্রি, আর ডাক বন্ধ করা, ডাক খোলা ছাড়া কোনো কাজই নেই পোস্ট্মাস্টারের।

এখানে যে বদলি হয়ে আসে, দু বেলা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই তার। মেশবার মতো লোক বলতে তো গোণা-গুণ্তি জন সাতেক। অক্জিলিয়ারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার, খাসমহলের জন দুই বাঙালী কর্মচারী আর জন তিনেক ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক। ডাক্তারের কাজ অজস্র, হাসপাতালে দুবেলা তো আছেই, তার ওপরে আবার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে হয় সব সময়ে। খাসমহলের লোক ফিতে আর চেন কাঁধে করে কোথায় কোথায় ঘোরে, সে শুধু তারাই জানে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক প্রায়ই তাদের নিবিড় জঙ্গলে ডুব মারে—পাত্তাই পাওয়া যায় না সহজে।

শুধু বিকেলে প্রায় সবাই জড়ো হয় একসঙ্গে। ডাক্তার, তার একটি আধা বাঙালী আধা নেপালী কম্পাউণ্ডার, খাসমহল আর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা। সকলেরই এক গরজ—একটি উদ্দেশ্য। ছাউনি-হিলের এই নির্বাসনে বিকেলের খবরের কাগজটি নিয়ে আসে কলকাতাকে। নিয়ে আসে পৃথিবীর খবর। এখানকার বিড়ম্বিত মানুষগুলো ওরই মধ্য দিয়ে নিজের অত্যন্ত পরিচিত জীবনের স্পর্শ পায়। মাত্র একজন ছাড়া কেউই এখানে স্ত্রী নিয়ে থাকে না, তাদের উৎকন্ঠিত চোখগুলো মেল্-ব্যাগের মধ্যে দু' একখানা বেসরকারী লেফাফার উৎসুক সন্ধান করে ফেরে।

দূর থেকেই পড়ন্ত আলোয় দেখা যাচ্ছিল ডাকঘরের সামনে

একদল মানুষের অধৈর্য প্রতীক্ষা। ডাক্তারের দীর্ঘ দেহ আর নীল কোটের উপরে তার শাদা উঁচু কলার দুটো দূর থেকেও উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে।

বাস এসে থামল।

—এত দেরী কেন?—পোস্ট মাস্টার অশোক মুখার্জি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

একটা শুঁটকি মাছের পুঁটলি নিয়ে ড্রাইভার বীর বাহাদুর বাস থেকে নামল। বললে, কী করব বাবু। সবাই কাজকর্ম সেরে আসবে, তবে তো!

অশোক চটে বললে, সবাইয়ের কাজকর্মের জন্যে তো সরকারী ডাক বসে থাকতে পারে না।

বাঁ-হাত দিয়ে কপালের ব্যাক-ব্রাশ চুলগুলো ঠিক করতে করতে বীর বাহাদুর বললে, সে আপনি মালিককে বলবেন—আমি হুকুমের চাকর। —তার স্বরে দুর্বিনয়, পানওয়ালী মেয়েটি এখনো মন জুড়ে আছে তার।

—তাই বলতে হবে!—অশোক আরো বিরক্ত হ'ল: সরকারের টাকাও নেবে আর যখন খুশি যাবে-আসবে ও সব চলবে না। দেখছ না, ভদ্রলোকেরা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন?

বীর বাহাদুর জবাব দিল না। মাছের পুঁটলি নিয়ে নীচে নিজের বস্তির দিকে পা বাড়াল।

কৌশিক ঘোষ নামতেই একটা পুলকিত কোলাহল উঠল উপস্থিত সকলের মধ্যে।

—এই যে দাদু, অতগুলো কী আনলেন বগল্‌দাবা করে? ভালো কিছু আছে নাকি?—অ্যাসিস্টাণ্ট রেঞ্জারের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

—কেক আছে কিছু। ক'টা মিষ্টি।

—চমৎকার।—ডাক্তার হাসল: তা হলে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন?

কৌশিক ঘোষও হাসলেন : নিশ্চয়।

—কখন যাব ?

—যখন তোমার খুশি।

—দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ সন্ধ্যের পরেই ?

—বেশ তো, বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।—বাস্-স্ট্যাণ্ডে চাকর অপেক্ষা করছিল, তার হাতে প্যাকেটগুলো তুলে দিয়ে কৌশিক বললেন, আমি ডাক নিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে বাবুরাও যাবে। চা-টার বন্দোবস্ত করে রাখবি।

স্বল্পভাষী নেপালী চাকর কোনো জবাব দিলে না। একবার মাথা নেড়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে এগিয়ে চলল।

খাস্ মহলের কর্মচারী সরোজ বললে, দাতু আমাদের মরুভূমিতে ওয়েসিস্। বলতে গেলে দাতুর জন্যেই আমরা এখানে টিঁকে আছি, নইলে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হত অনেক দিন আগেই।

ততক্ষণে নেপালী কাঞ্ছা ডাক নিয়ে পোস্ট অফিসের বারান্দায় তুলেছে। সকলে পা বাড়ালেন সেদিকেই। খবরের কাগজ মেল-ব্যাগে আসে না—দার্জিলিঙের এজেণ্ট্ ওগুলোকে আলাদা বাণ্ডিলে বেঁধে দেয়। ইতিমধ্যেই হাতে হাতে বিলি হয়ে গেছে সেগুলো। সব রকমই আছে। স্টেট্সম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার, যুগান্তর। এখানে নানা জন নানা কাগজ রাখেন, এক্সচেঞ্জ করে পড়বার সুবিধে হয়।

—কৃপ্লানীর স্টেটমেণ্ট দেখেছেন আজ ?—খবরের কাগজে চোখ রেখেই ডাক্তার বললেন, কী কন্‌ফিউজিং! শ্যামও রাখবে—কুলও রাখবে! এদিকে অপোজিশন করবি, ওদিকে আপোষের ব্যবস্থা! আরে তু-নৌকোয় পা দিয়ে কখনো পলিটিক্স্ হয়!

ডাক্তার একদা রাজনীতি করত। সেই উনিশ শো তিরিশ সালে কলেজে পড়তে পড়তে জেলও খেটেছিল মাস তিনেক। সেই থেকে তার পলিটিক্সে অনুরাগ। এখানকার অনিচ্ছুক ক্লান্ত মানুষগুলোর কাছে সে যথাসাধ্য চল্‌তি রাজনীতির ভাষ্য করতে

চেষ্টা করে। শ্রোতারা উৎসুক নয়—খানিক পরেই তারা হাই তুলতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

ডাক্তার বলে, হোপ্‌লেস্! একেবারে কূপমণ্ডুক! খালি চাকরী করতেই শিখেছে এরা।

শুধু মাঝে মাঝে ডাক্তারের মেজাজ বেশ জমে ওঠে। যুদ্ধ-ফেরত নেপালী ক্যাপ্টেন আছে একজন। লোকটা মাতাল, কোটের পকেটেই বোতল থাকে, যখন-তখন সেইটে মুখের কাছে ধরে খানিক গিলে নেয় নির্জলা। রাজনীতির বিশেষ কিছু বোঝে না, তবু ডাক্তারকে চটিয়ে দেবার জন্যে তার দুটো একটা বুলিই যথেষ্ট।

—পলিটিশিয়ান বলতে হিট্‌লারকে। আরেঃ বাপ! কী তাগদ—ক্যায়সা হিম্মৎ! আজ দুনিয়ায় ওই রকম গোটাকয়েক লোকই চাই।

—কী বললে? ডাক্তার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন: হিটলার কী করেছেন জানো? শোনো তা'হলে—ডাক্তারের অনর্গল বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়।

ততক্ষণে হয়তো নেশার ঝোঁকে লক্ষ্মীপ্যাঁচার মতো ঝিমুতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন। একটি বর্ণ সে বোঝেনি, বোঝবার জন্যে কোন গরজও নেই। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে বলে, যাই বলো ডাক্তার, হিটলার হচ্ছে একটা মরদের মতো মরদ।

এর পরে ডাক্তার দ্বিগুণ বেগে শুরু করে। নিজেও জানে এ তার স্বগতোক্তি—হয়তো একটা কথাও ক্যাপ্টেন শুনতে পাচ্ছে না। তবু ক্যাপ্টেনকে ডাক্তারের দরকার। তার মনকে খোঁচা দিয়ে উত্তেজিত করে তোলার মতো অন্তত একটি উপকরণ না থাকলে তারই বা চলে কী করে?

আজ ক্যাপ্টেন হাজির নেই, অতএব কৃপ্‌লানী সম্পর্কে ডাক্তারের মন্তব্যে কেউ প্রতিবাদ করল না। তার বদলে উৎসাহিত হয়ে উঠল খাসমহলের চ্যাটার্জি। এক সময়ে নাকি কালীঘাটে বি-টিমে সে সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলত, সুতরাং তার ঝোঁক সম্পূর্ণ অন্য দিকে।

—নাঃ, এবারে ফুটবল খেলার কোনো স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই। দেখুন না, মোহনবাগান ধাঁ করে একটা গোল খেয়ে বসে রয়েছে। কী আশ্চর্য, একটা টিমের ওপরও নির্ভর করা যাবে না! একটা খেলোয়াড় নেই যে গোল মাউথে গিয়ে স্কোর করতে পারে। আমি বলছি শৈলেশদা—ডুরাণ্ড কিংবা রোভার্স কাপে বাংলার কোনো টিমের চান্স তো নেই-ই, এবারে আই-এফ্-এ হয় মহীশূর নইলে বম্বেতে চলে যাবে।

—যাক্—ভালোই হবে!—অ্যাসিস্ট্যান্ট্ রেঞ্জার শৈলেশ দে মোটা-সোটা লোক—ছাত্র-জীবন থেকে টাগ্-অব্ ওয়ারের পিলার হওয়া ছাড়া আর কোনো খেলা-ধূলোয় যোগ দেননি তিনি। পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে নাকে এক টিপ গুঁজে দিয়ে শৈলেশ বললেন, একেবারে চলে যায় তো আরো ভালো হয়। বাপ্ রে, ফুটবল খেলা নয়তো যেন কম্যুনাল্ রায়ট! খেলার মাঠে মারামারি করছে, হাটে-বাজারে ট্রামে-বাসে মারামারি করছে, এমন কি ভাইয়ে ভাইয়ে পর্যন্ত হাতাহাতি হয়ে যাচ্ছে। ফুটবল খেলা কি ভদ্রলোকের জিনিশ? ফুটবল আইন করে বন্ধ করা উচিত—'ব্যান' করা উচিত।

—ছিঃ—ছিঃ শৈলেশদা!—চ্যাটার্জির হয়ে সরোজ প্রতিবাদ জানালো।

—ছিঃ—ছিঃ আবার কী?—শৈলেশ দে নাক-মুখ কুঁচকে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাঁচি সামলালেন। তারপর বললেন, ফুটবল খেলা যদি ভদ্রসমাজের ব্যাপার হয়, তাহ'লে বিহারী কুস্তি আর কী দোষ করল? ওদের আহীরদের ভেতরে কুস্তি দেখেছ? এক-জন আর একজনকে চিৎ করলেই ব্যাপারটা থামল না, তখন দুই পালোয়ানের সাপোর্টারেরা তাদের পেল্লায় লাঠি দিয়ে পরস্পরকে কাৎ করতে চেষ্টা করে। চার-ছ'টা খুন যখন-তখন। ভাগলপুরে একবার সে কুস্তি দেখতে গিয়ে আমি ভাগবার পথ পাই না। কলকাতার ফুটবলও ওই স্তরেই পৌঁছেছে—বরং আরো খারাপ।

ক্বপ্‌লানীর ব্যাপারে যখন সমর্থন পাওয়া গেল না, তখন ডাক্তার শৈলেশ দেরই পক্ষ নিলেন। খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বললেন, যা বলেছেন।

চ্যাটার্জি করুণ মুখে চুপ করে রইল। বেরসিকের দল!

শৈলেশ বললেন, তার চেয়ে ছাখো তো, কলকাতায় কোনো বাংলা ফিলিমের খবর আছে কি না। আসছে মাসে যখন যাব দেখে আসব সেই সময়।

—আর এক বছর ধরেই তো আসছে মাসে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলছেন শৈলেশদা। কবে আর সেই আসছে মাস আসবে?—ডাকের ব্যাগ থেকে চোখ তুলে আশোক হাসল।

এইবার শৈলেশের চুপ করবার পালা। গোলগাল প্রসন্ন মুখে ব্যথার ছায়া ঘনিয়ে এল। স্ত্রৈণ মানুষ শৈলেশ—ছাউনি-হিলে বদ্‌লী হাওয়ার পরে তাঁর অবস্থা হয়েছে মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো। অথচ স্ত্রী অবস্থাপন্ন সরকারী চাকুরের একমাত্র মেয়ে—নিউ দিল্লীর আবহাওয়ায় মানুষ। একবার ছাউনি-হিলে তাঁকে এনেছিলেন শৈলেশ, তারপর সাতদিনের দিনই ট্রাঙ্ক্‌ কল্‌ পেয়ে তাঁর ভাই এসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেছে। স্ত্রী বলেছেন, বাপরে কী জঙ্গল! দিন-তুপুরেই চারদিকে ছমছমে অন্ধকার। আলো নেই—মানুষজন নেই—থাকা যায়?

শৈলেশ তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, জঙ্গলের চাকরিই এই। ট্রান্স্‌ফার করে দিলে সুন্দরবনে বাঘ-ভালুকের সঙ্গেই তো গিয়ে থাকতে হবে।

স্ত্রী বলেছেন সে তুমি যেয়ো, তোমাকে দেখলে বাঘ-ভালুকেও ভয় পায়। আমি জঙ্গলে থাকতে পারব না। তোমাকে বিয়ে করে বনবাসে থাকতে হবে এ জানলে বিয়ের রাত্রেই আমি বেঁকে বসতাম।

ভারী মনোবেদনা পেয়েছিলেন শৈলেশ। তুটো কারণে। প্রথমত তাঁর শরীর সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অন্যায় কটাক্ষ ছিল স্ত্রীর কথায়।

দ্বিতীয়ত, তিনি যেখানে থাকবেন, স্ত্রী সেইটেকেই স্বর্গলোক বলে ধরে নেবেন—এম্‌নি একটা প্রত্যাশাও তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

শৈলেশ আন্দাজ করতে পারেন, স্ত্রী এক ধরণের অবজ্ঞা পোষণ করেন তাঁর সম্বন্ধে। দুঃখও পান। তবু রাগ করতে পারেন না স্ত্রীর ওপরে। যার যেমন অভ্যাস। নিঃশব্দে নিজের ভেতরেই ব্যথাটাকে বহন করে চলেন।

আজ এক বৎসর বিরহ-যন্ত্রণায় কাল কাটাচ্ছেন। ছুটি পাচ্ছেন না কিছুতেই। গতবার পূজোর ছুটিতে যাবেন—সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ফরেস্টের একটা অংশ নিয়ে গোলমাল বাধল। কোন্ চা-বাগান নাকি তার প্রাইভেট ফরেস্টের মধ্যে সরকারী জমি এন্‌ক্রোচ করে নিয়েছে। তাই নিয়ে এন্‌কোয়ারী, নানা হাঙ্গামা—সেই থেকে আর বেরুতেই পারছেন না। ক্রমাগত ছুটির চেষ্টা করছেন, আর আশা আছে, আসছে মাসে তিনি কলকাতায় যাবেন।

অশোকের কথায় শৈলেশের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—যাব হে যাব, ছুটির দরখাস্ত তো করাই রয়েছে।

চিঠি যা এসেছিল, এর মধ্যেই তার অর্ধেক বিলি হয়ে গেছে। যা হয়নি, কাল সকালে পিয়ন তা পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে আসবে। শৈলেশ উঁকি মেরে দেখলেন। সামান্য ক'টি চিঠির ভেতরে তাঁর নামের একখানাও লেফাফা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। স্ত্রী চিঠি লেখেননি।

রুচির একখানা চিঠি পেয়েছেন কৌশিক ঘোষ। সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড। বাবা, তুমি ভালো হয়ে থেকো। ভালো করে খেয়ো। তোমার মুরগীদের কুশল তো? আমার ক্লাশ বন্ধ হতে আরো পাঁচ সাতদিন দেরী আছে। ছুটি হলেই তক্ষুণি তোমার কাছে চলে আসব।

ইতিমধ্যে পোস্টমাস্টার অশোক হাতের কাজগুলো সব মিটিয়ে ফেলেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে আসছিল—কাঞ্ছা একটা লণ্ঠন এনে জ্বেলে দিয়েছিল টেবিলে। লণ্ঠনের শিখাটাকে প্রায়

নেবানোর মুখে এনে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তালা দিলে পোস্ট অফিসে।

কৌশিক ঘোষ স্টেট্সম্যানটা ভাঁজ করে বগলে নিলেন, তারপর বললেন, নাও চলো সবাই।

—সত্যিই কি যেতে বলছেন নাকি দাদু?

—মিথ্যে করে বলব নাকি?

শৈলেশ একটু অপ্রস্তুত হলেন: আমরা ঠাট্টা করছিলাম। এতদূর থেকে কষ্ট করে কেক্‌গুলো বয়ে এনেছেন, আমরা গিয়ে আর ওগুলো ধ্বংস করি কেন?

কৌশিক হেসে বললেন, এমন কিছু দুর্মূল্য বা দুর্লভ জিনিস নয় ও-গুলো। আজ আনা হয়েছে, কালও আবার কাউকে দিয়ে আনানো চলতে পারে। তোমরা সবাই আনন্দ করে আমার ওখানে চা খাবে, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড়ো লাভ।

ডাক্তার মাথা চুলকোতে লাগল: হাসপাতালে আমার একটু কাজ ছিল—

কৌশিক ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন: এসো হে এসো, তোমাব আর বেশি ওস্তাদি করতে হবে না। গিয়ে তো সব বসে বসে খবরের কাগজের প্রত্যেকটা লাইন মুখস্থ করবে। সেটা একটু পরে হলেও কোন ক্ষতি নেই, এখন চলো আমার সঙ্গে।

দলটা রওনা হল।

কী-ই বা করা এ-ছাড়া? এই রকম মধ্যে মধ্যে এক একদিন সন্ধ্যায় এর-ওর ওখানে গিয়ে জমিয়ে বসা। তা'ছাড়া কোনো কাজ নেই—বিষণ্ণ শীতার্ত সন্ধ্যায় নিজেকে নিয়ে বসে বসে মন্থন করা ছাড়া আর করণীয় নেই কিছুই। চারদিকে বিবর্ণ অন্ধকার নামতে থাকবে—পাহাড়ের চূড়োগুলো কালো আকাশে হেলান দিয়ে কতগুলো দৈত্যের মতো ঘুমিয়ে পড়বে, পাইনের জঙ্গল এক এক ঝলক হাওয়া লেগে অদ্ভুত রহস্যময় সুরে মর্মরিত হয়ে উঠবে। তখন এই রাত যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে বুকের ওপরে চেপে বসতে

চাইবে, ভাবতে ইচ্ছে করবে—তৃণাঞ্চিত কোমল সমতলের মাটি, তার উষ্ণ-মধুর উত্তাপ, জীবনের চাঞ্চল্য আর মানুষের কোলাহল, আর—

সেই দীর্ঘশ্বাসটাকে ভোলবার জন্যে কিছুক্ষণের এই আড্ডা। এক আধ বাজী তাস খেলা কোনো কোনো দিন। তারপরে রইল ছাউনি-হিলের মৃত নিঃসঙ্গ রাত্রি, আর ঘুমের মধ্যে দুর্বোধ্য ভয়ের ছায়া-সঞ্চার।

দু'ধারে অন্ধকার ঘন-কজ্জলিত হয়ে এসেছে। জঙ্গলের কোলে কোলে যেন সৃষ্টির আদিম-তমিস্রা। কৌশিক ঘোষের বাংলোয় যেতে অনেকখানি পথ পেরুতে হয়, প্রায় আধ মাইল ভেতরে যেতে হয় বাসের রাস্তা থেকে। এককালে ভালোই ছিল রাস্তাটা, কিন্তু বহুকাল ধরে উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে নুড়ি বেরিয়ে পড়েছে সর্বত্র। ঝর্ণার ওপর কাঠের কালভার্টগুলো পচতে সুরু হয়েছে, ভেঙে পড়বে কিছুদিন পরেই।

টর্চের আলো পথের ওপরে ফেলে দলটা চলছিল। কোথা থেকে জোরালো মোটরের আলো এসে পড়ল সকলের গায়ে। হর্ণের আওয়াজও শোনা গেল একটা।

—এ রাস্তায় গাড়ী কোথায় যাচ্ছে ? আমার বাংলোর পরে তো আর পথ নেই।—বিস্মিত হয়ে বললেন কৌশিক ঘোষ।

—তাহ'লে হয়তো আপনার কাছেই আসছে কেউ ?

—আমার কাছে ?—কৌশিক ভ্রূকুঞ্চিত করলেন: আমার বাড়ীতে কে আর আসবে ? সেরকম তো কোনো কথা নেই।

গাড়ীখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল ওঁদের দিকেই। তারপর হাত দশেক সামনে এসে থেমে দাঁড়ালো। গলা বাড়ালো একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বাঙালী ছেলে। ডাক দিয়ে বললে, দয়া করে শুনবেন একটু ?

গাড়ীর পাশে গিয়ে সবাই দাঁড়ালেন। কালো রঙের প্রকাণ্ড মোটর, জিনিসপত্রে বোঝাই। ক্যারিয়ারটা আধখানা খুলে আছে; তাতেও কুলোয়নি, ছাতের সঙ্গে দড়ি-দড়া দিয়ে গোটাকতক

হোল্ড অল্ বেঁধে নিতে হয়েছে। গুটি তিনেক মহিলা গাড়ীতে—জন দুই পুরুষ।

বাঙালী ছেলেটি বললে, বারো নম্বর বাংলো কোথায় বলুন তো?

—বারো নম্বর বাংলো? মানে ডাক্তার চক্রবর্তীর 'বিজন-বাস'?

—আজ্ঞে তাই হবে। অমনিই একটা কিছু নাম আছে বোধ হয়। আমরা তাঁরই আত্মীয়—সেখানে থাকব বলে এসেছি।

—সে তো এ রাস্তায় নয়।—অশোক বললে, এটা ডাই-ভারসন। আপনারা ঘুরে মেন রোডে চলে যান, সেখান থেকে কয়েক ফার্লং এগিয়ে বাঁদিকে শ'খানেক ফুট নিচে 'বিজন-বাস'।

বাঙালী ছেলেটি ক্লান্ত হাসি হাসল: এ যেন গোলাক-ধাঁধা। সবাই বলছে আমরা ছাউনি-হিল এরিয়ায় ঢুকে পড়েছি, অথচ কোথাও যে বাড়ী-ঘর আছে তাই মনে হচ্ছে না। যে দিকে তাকাচ্ছি খালি অন্ধকার আর অন্ধকার—!

—সন্ধ্যেবেলায় এমনিই মনে হয় বটে!—কৌশিক ঘোষ হাসলেন: বাড়ীগুলো ঠিক পথের ধারে নয় কিনা। তা'ছাড়া বেশির ভাগই খালি পড়ে আছে। সন্ধ্যে-প্রদীপও জ্বলে না। সেই জন্যেই এই রকম মনে হচ্ছে। দিনের বেলায় আর এ রকমটা লাগবে না। তা' এক কাজ করুন। বড় রাস্তা দিয়ে খানিক এগোলেই দেখবেন পাশাপাশি কয়েকটা দোকানে আলো জ্বলছে। ওদের জিজ্ঞেস করবেন—ওরাই দেখিয়ে দেবে এখন।

—উঃ, কী জায়গাতেই নিয়ে এলে দাদা! যেন আফ্রিকার জঙ্গলে এসে পৌছেছি।—ভেতর থেকে একটি তরুণীর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—কাল সকালে বোধ হয় এত খারাপ লাগবে না।—কৌশিক ঘোষ আবার জবাব দিলেন।

ছেলেটি শুকনো গলায় বললে, ধন্যবাদ। দেখি খুঁজে। আমরা তো প্রায় দিশেহারা হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনাদের

টর্চের আলো দেখে ভরসা করে এগিয়ে এলাম। কতক্ষণে যে বাংলোর সন্ধান পাব, তাই বুঝতে পারছি না।

—না, না, আর বেশি ঘুরতে হবে না। যে-ভাবে বললাম, ওই রকম করে চলে যান। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

—ধন্যবাদ।—ছেলেটি আবার বললে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে বললে, আপনারা ?

—আমরা আপনাদেরই প্রতিবেশী। ছাউনি-হিলেই থাকি।—শৈলেশ জবাব দিলেন।

—যাক, ভালোই হল। বারো নম্বরে আমরা উঠছি। একটু খোঁজ-খবর নেবেন দয়া করে। এখানে আমাদের আবার কিছুই জানা-শোনা নেই—আপনারা যদি দয়া করে একটু সাহায্য করেন—

—কিচ্ছু ভাববেন না—কৌশিক আশ্বাস দিলেনঃ কাল সকালে গিয়েই আমরা পৌঁছুব। শুধু সাহায্য কী বলছেন, নতুন কেউ এখানে এলে আমরা তাদের রীতিমতো বিব্রত করে তুলি।

—অনুগ্রহ করে বিব্রতই করবেন তবে—সেই তরুণীটির গলা শোনা গেল আবার। চশমার একজোড়া সোনালী ফ্রেম গাড়ীর ভেতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

—বেশি উৎসাহ দেবেন না আমাদের, বিপদে পড়বেন—সরোজ মন্তব্য করল।

সবাই হেসে উঠল। যে ছেলেটি গাড়ী চালাচ্ছিল, তার পীড়িত মুখেও হাসি ফুটে উঠল এবার। ব্যাক্ করে গাড়ীটা বড় রাস্তার দিকে ফিরে গেল—পেছনের লাল আলোটা দেখা যেতে লাগল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

সবাই আবার চলতে আরম্ভ করল।

শৈলেশ বললে, কোত্থেকে এল বলুন তো ?

অশোক বললে, আমি বলতে পারি। গাড়ীতে জলপাইগুড়ির নম্বর।

—কখনো জলপাইগুড়ির লোক নয়।—চ্যাটার্জি মাথা নাড়ল।

—কী করে জানলে ?

—আমি জানি। নিশ্চয় ওরা কলকাতা থেকে আসছে।

—কলকাতার চেহারা কি গায়ে লেখা থাকে নাকি ?—ডাক্তার হাসল।

চ্যাটার্জি বললে, অনেকটা। মফঃস্বলের মেয়ে হলে ও-রকম মাঝে পড়ে টকাস্ টকাস্ করে কথা কইত না। তা'ছাড়া জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির লোক বন-জঙ্গল'কে ভালো করেই চেনে—অন্ধকার দেখলেই তারা এমন করে ঘাবড়ে যায় না। নিশ্চয় কলকাতার লোক—যাকে বলে 'ড্যাঞ্চি'।

—অত স্পেকুলেশন করে কী হবে ? কাল সকালেই জানা যাবে সমস্ত।—ডাক্তার বললেন।

তা বটে—কাল সকালেই জানা যাবে। তবু সকলের মনেই অল্প-বিস্তর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এখানে নতুন কেউ আসার অর্থই যেন মরুভূমিতে মেঘের খবর। পাহাড়ের এই নির্জন কারাবাসে যাদের একঘেয়ে শ্রান্ত দিনচর্চা, তাদের কাছে কোনো নতুন মানুষ এলেই একটা আশ্চর্য প্রত্যাশায় তারা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলো যেন তাদের সর্বাঙ্গে একটা তপ্ত জীবন্ত পৃথিবীর খবর বয়ে এনেছে—নিয়ে এসেছে তৃষ্ণার জল।

কৌশিক ঘোষ বললেন, তাহলে বছরের প্রথম চেঞ্জার এই এল!

ডাক্তার বললেন, হয়তো এই-ই শেষ। পাশে দার্জিলিং থাকতে এখানকার অন্ধকারে কে আর সাধ করে পড়ে থাকতে আসবে! তা ছাড়া ক্লাব নেই, সিনেমা নেই—

অশোক জুড়ে দিলেঃ দামী দামী জামা-কাপড় পরে বেরুলে সেগুলো দেখবার লোক নেই! এখানে কি আর ভদ্রলোকের পক্ষে থাকা সম্ভব!

—যা বলেছ!—শৈলেশ জুড়ে দিলেন। একটা ব্যক্তিগত ক্ষোভের সুর গুমরে উঠলো তাঁর গলায় ভেতর থেকেঃ খাস কল-কাত্তাইদের এ জায়গা ভালো লাগবে কেন ?

বাঁ-দিকে পাইন বনের মধ্যে কৌশিক ঘোষের বাংলোর দোতলায় আলো জ্বলছে। অতিথিরা আসবে ; বাইরের সিঁড়ির কাছে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে দিয়েছে চাকরটা—এই আরণ্যক পরিবেশে ওই আলোটাকে কেমন রসাভাসের মতো মনে হচ্ছে। এক ঝলক তীক্ষ্ণ আলোয় লনের হাইড্রেন্‌জিয়ার গুচ্ছ তোড়া-বাঁধা মুক্তোর মতো ঝলমলিয়ে উঠছে।

কৌশিক ঘোষের কুকুরদুটো লনে মানুষের এক সার দীর্ঘায়িত ছায়া দেখে তারস্বরে অভ্যর্থনা জানাল। কৌশিক ঘোষ সস্নেহে বললেন, ডেভি, বেবি আমরা—আমরা !

তিন

প্রায় রাত ন'টার সময় ওরা চলে গেল।

একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন কৌশিক। প্রকাণ্ড ল্যাম্পটার উজ্জ্বল আলোতেও মস্ত ঘরখানার সবটা উদ্ভাসিত হয়নি। তিন দিকে দেওয়াল-জোড়া বইয়ের শেলফে এখানে-ওখানে এলোমেলো ছায়ার টুকরো। কৌশিক ঘোষ একবার বইগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। নানা জাতের বইয়ের বিচিত্র সংগ্রহ। এ-ঘরে যে-কেউ পা দেবে সেই-ই বলবে বইয়ের মালিকের কোনো জিনিসেই অরুচি নেই। ডিটেক্‌টিভ্‌ বই, ইংরেজি কাব্য, উপন্যাস, ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান। এককালে নির্বিচারে বিলিতী বই কিনতেন কৌশিক ঘোষ। সবই যে পড়তেন তা নয়—কেনাটাই ছিল তাঁর বিলাস। এখানেও তিনি তাঁর বইগুলোকে সঙ্গে করে এনেছেন—মায়া কাটাতে পারেন নি। মাঝে মাঝে দুটো-একটার দু'চারখানা পাতা ওলটান, কিন্তু পড়তে আর পারেন না। বইয়ের ভেতরে একাগ্র হওয়ার মন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

দেওয়ালে গুটিকয়েক ছবি। একখানা রেঙ্গুনে তোলা গ্রুপ্‌ ফটো —একবার দুর্গাপূজোর তিনি সেক্রেটারী ছিলেন—তারই স্মৃতি বহন করছে ওখানা। তাঁর স্ত্রীর ফটো আর একখানা। একটি তাঁর বড় মেয়ে আর তার মাদ্রাজী স্বামীর ছবি—বিয়ের পরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। আর খান দুই ল্যাণ্ডস্কেপ্‌—এই ছাউনি-হিলেরই বর্ণরূপ। তাঁর ছোট মেয়ে রুচি এঁকেছে।

এত বই—এত মানুষের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে কী আশ্চর্য শব্দ-কোলাহল। তবু—তবু কী নির্জন! ওরা চলে যাওয়ার পরে আরো নির্জন মনে হচ্ছে ঘরটাকে। নিজেকে তাঁর প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে —যা তুমি চেয়েছো, তা কি এখানে তুমি পাবে? শূন্যের মধ্য থেকে মুঠো বাড়িয়ে শূন্যতাই শুধু তুমি কুড়িয়ে নিতে পারো—তার বেশি আর কিছুই নয়।

এর চেয়ে কলকাতায় থাকলেই ভালো হত। কলকাতা—

নাঃ—অসম্ভব! কৌশিক ঘোষ চমকে উঠলেন। ও-কথা কোনো মতেই ভাবা চলে না আর। তার ওপরে চিরদিনের মতো ছেদ পড়ে গেছে। ছাউনি-হিলের বাইরে কোনো পৃথিবীই আর অবশিষ্ট নেই!

স্মৃতির মধ্যে ডুব দিলেন কৌশিক ঘোষ। পনেরো বছরের অতীত ইতিহাস ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ছাউনি-হিল নামই তার অতীত পরিচয় বহন করছে। একদা এই পাহাড় ছিল ঘন-অরণ্যে ছাওয়া, এখানে ছিল হরিণ আর ভালুকের অবাধ রাজত্ব। পাহাড় ভেঙে বেপরোয়া খুশিতে পাগলা ঝর্ণা নামত, শানাই ফুল শিশিরের ছোঁয়ায় ফুটে উঠত নিজের আনন্দে। কিন্তু অরণ্যের এই আদিম-শান্তি বেশিদিন রইল না। দলে দলে ইঞ্জিনীয়ার এল একদা, এল নানা ধরণের যন্ত্রপাতি। ডিনামাইটে পাথর উড়ল, বন কাটা পড়ল, ক্যাণ্টনমেণ্ট্ বসল এখানে।

ছাউনি-হিল তখন জম-জমাট। সৈন্যদের ব্যারাক, অফিসারদের কোয়ার্টার। প্যারেড্ চলে, চাঁদমারী হয়, ক্লাবে সাহেব অফিসারদের স্ত্রীরা বল্‌ড্যান্স্ করে। বেশ কয়েক বছর এইভাবেই কাটল। তারপরে নাকি দেখা গেল আশ-পাশের চা-বাগানগুলোর সঙ্গে ছাউনি-হিলের মিলিটারীদের প্রায়ই গোলমাল বাধছে। আরো দেখা গেল, কাছেই নেপাল-বর্ডার থাকায় খুন-জখম করেই লোকগুলো সেই বর্ডার পার হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই।

নানা ঝঞ্ঝাটে শেষে একদিন ক্যাণ্টনমেণ্ট্ উঠে গেল এখান থেকে। সব মিলে সৃষ্টি হল একটা বিরাট শ্মশান। ব্যারাকগুলো ভেঙে পড়তে লাগল—যেন একটা পোড়ো-বাড়ীর শহর হয়ে দাঁড়াল জায়গাটা। সরকার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেনঃ ছাউনি-হিলের বাড়ী আর জমিগুলো নিলাম করা হবে।

এলাহাবাদ না লক্ষ্ণৌ—কোথাকার ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সের এক প্রফেসার ছিলেন—ডাক্তার মজুমদার তাঁর নাম। ব্যাচেলার লোক, নানা অসম্ভব কল্পনা নিয়ে দিন কাটাতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে তিনি ছাউনি-হিলের দিকে আকৃষ্ট হলেন। ভাবলেন এইখানে তিনি একটি আদর্শ স্বাস্থ্য-নগরী গড়ে তুলবেন।

অতএব মাত্র হাজার পনেরো টাকায়—বলতে গেলে জলের দরেই তিনি এখানকার অধিকাংশ ঘর-বাড়ী কিনে ফেললেন। তারপর শুরু করলেন সাজাতে। বাড়ীগুলোর সংস্কার করে তাদের চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। ব্যারাক নাম্বার টেন হয়ে দাঁড়াল: 'স্বপ্নবীথি', সিঙ্গল্ মেনস্ কোয়ার্টার হল 'বন্ধু-মিলনী', অফিসার্স কোয়ার্টার নাম্বার ফিফ্‌টিন হল: 'শৈল-নিবাস'। রোড্ নাম্বার ওয়ান হল 'ছায়াপথ', রোড্ নাম্বার ফাইভ্ হয়তো হয়ে দাঁড়াল: 'হনিমুন পাথ', চাঁদমারী অঞ্চলের নাম দিলেন, 'পিস্ অ্যাভিনিউ'।

মনের মতো করে স্বাস্থ্য নিবাস সাজিয়ে ডাক্তার মজুমদার দেশের লোককে তার দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাশে দার্জিলিং কার্শিয়াং কালিম্পং থাকতে লোক ছাউনি-হিলের দিকে ফিরেও তাকালো না। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ডাক্তার মজুমদার আরো অনেক টাকা খরচ করলেন। তাঁর দু' চার জন বন্ধু দু' এক দিনের জন্যে বেড়াতেও এলেন। দিন দুই এদিক-ওদিক পায়চারী করে তাঁরা বললেন, দিব্যি জায়গাটি, দার্জিলিংয়ের চেয়ে ঢের ভালো। এখানে থাকলে শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না।—এই বলে তাঁরা দার্জিলিঙে ফিরে গেলেন।

এমন সময় যুদ্ধ ঘনিয়ে এল। বর্মা, আবাকান, তারপর কলকাতা। প্রথমে বোমা নামল বজ্‌বজে। সেখান থেকে কলকাতার বুকের ওপর। লো-ফ্লাইটে নেমে খিদিরপুরের ডকে দিন-দুপুরে মেশিন-গানিং করে গেল জাপানীরা।

পালাও পালাও রব সুরু হল কলকাতায়। দিনের আলো

শ্মশানের রোদের মতো খাঁ-খাঁ করে, রাত্রির অন্ধকার ঘোমটা-ঢাকা আলো নিয়ে তৈরী করে অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন। সাইরেনের ডাকিনী-কান্না রক্ত হিম ক'রে আনে। এইচ্-ইর বিস্ফোরণ আর অ্যাক্-অ্যাক্ ব্যাটারীর ফ্ল্যাশ—স্নায়ুগুলোকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে দিতে চায়।

সেই সময় অনেক অকৃত্রিম কলকাতা-বিলাসীর হঠাৎ মাতৃভূমিকে মনে পড়ল—দেশ-জননীর দুর্বার আকর্ষণ আর সামলাতে পারলেন না তাঁরা। তিন পুরুষ ধরে বেড়ে-ওঠা পোড়ো-ভিটের জঙ্গল আবার কাটা গেল, গোটা কয়েক সাপ মরল, কিছু ইঁদুর, বাদুর, চামচিকে—ছুঁচো বাস্তুহারা হল। খোলার গরম বালি থেকে যেমন খই ছিটকে পড়তে থাকে, তেমনি ভাবেই কলকাতার কায়েমী-অস্থায়ী স্থাবর-অস্থাবরেরা দিকে দিকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়লেন।

সেটা শীতকাল। হ্যাপি ক্রিস্‌মাস্। কপি-কড়াইশুঁটি-গল্‌দা চিংড়ীর মরশুম। ক্রিকেটের মাঠ, ডগ রেস্, সার্কাস, নন্-স্টপ্ রেভ্যু, নানা একজিবিশন। কিন্তু সব মায়া এখন। নানা রঙের মরশুমী ফুলের মতো এই কলকাতা আর থাকবে না। বৌবাজারের মোড়ে এক বিরাট পিপুল গাছের তলায় বসে হুঁকো টানতে টানতে জবচার্ণক যে শহরের পত্তন করেছিলেন, কিছু দিনের মধ্যেই তা ধূলো-ধূলো হয়ে মিশে যাবে মাটিতে। আর এক বিশালতম ফতেপুর সিক্রীর মতো মুখ ভ্যাংচাবে ইতিহাসকে। তারপর মাথা তুলবে প্রকৃতি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা দেবে অরণ্য। আর চার্ণকের প্রেতাত্মা সেই জটিল গহন অরণ্যের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলে ঘুরে বেড়াবে। পালাও—পালাও। দিল্লী, দার্জিলিং যে দিকে চোখ যায়।

দুরন্ত শীত দার্জিলিঙে। তাতে কী হয়েছে। ইন্‌সেনডিয়ারী বমে পুড়ে মরার চাইতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঢের ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল উপেক্ষিতা ছাউনি-হিল। যারা আর কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটাতে পারলেন না, তাঁরা ছুটে

এলেন এখানে। একটি বাংলোও কোথাও আর খালি রইল না। বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বলল, প্রত্যেকটি নিরালা বনপথ সরগরম হয়ে উঠল, নানা রঙের শাড়ী-স্যুট-শাল ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল এদিক-ওদিক। রেডিয়োর গুঞ্জন, গানের আওয়াজ, হাসির কলতান, পাইন বনের ভেতরে টুকরো-টাক্‌রা প্রেমকাব্য। টিলার মাথায় একটা ক্লাব পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল—একটুখানি সমতল খুঁজে নিয়ে সুরু হল টেনিস-ব্যাডমিন্টন। বেশ কয়েকটি আইবুড়ো মেয়ে ঝর্ণার ধারে, শানাই ফুলে ভরা ছায়ার নিচে তাদের শিকার পর্যন্ত ধরে ফেলল। মজুমদারের স্বপ্ন আশার চাইতেও অনেক বেশি সার্থক হল—হু-হু করে বিক্রী হয়ে গেল বাড়ীগুলো।

কিন্তু ছার্উনি-হিলের ক্ষণ-যৌবন বেশি দিন টিকল না। কলকাতা দাঁড়িয়ে রইল যথাস্থানেই। যুদ্ধ তাকে দুটো একটা নখের আঁচড় দিয়েই ছেড়ে দিলে এ-যাত্রা। অতএব এক এক করে বাড়ীগুলো খালি হতে লাগল, একটি একটি করে নিবতে লাগল আলো, একে একে শূন্য হয়ে এল পাইন বনের পথ। দামী সিগারেট আর সিগারেটের টুকরো, লিপস্টিকের ধ্বংসাবশেষ, নিউ মার্কেটের এক আধ পাটি শৌখিন স্লিপার, বিলাতী বইয়ের রঙীন মলাট, হেরিং মাছ আর মাখনের টিন, বিদেশী ক্রিমের কৌটো আর হেয়ারপিন, বৃষ্টির পর বৃষ্টির ধারায় ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে এল।

আরো দু-এক বছর জের চলল কিছু কিছু। কিন্তু নদীর উৎস মুখ বুজে গেলে যেমন করে তার বান একটু একটু করে মন্দা হয়ে আসে—তেমনি করে থেমে এল চেঞ্জারের স্রোত। এখন দার্জিলিং বেড়াতে এলে কেউ কেউ একবার ছার্উনি-হিলে আসেন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য, কিংবা বড়জোর একটি রাত স্তব্ধ অন্ধকার আর কুয়াশা ছাওয়া আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে অস্বস্তিভরে কাটিয়ে যান, সকালের সোনালি আলো পাইন বনের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দেবার আগেই তাঁদের মোটর পৌঁছে যায় দার্জিলিঙে। তাঁদের শূন্য বাগানে পাহাড়ী গোলাপের ঝাড় অযত্নে

ফুল ফুটিয়ে ঝরে যায়—নেপালী কীপাররা যে-টুকু পারে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে, পেঁয়াজ স্কোয়াশের লতা তোলে—পোষে মুরগী।

সেই স্বর্ণযুগেই কৌশিক ঘোষ প্রথম এসেছিলেন এখানে। সেই যুদ্ধের তাড়াতেই।

কিন্তু আর ফিরে গেলেন না। কলকাতায় দার্জিলিঙে ব্যাঙ্কে কিছু সঞ্চিত আছে—তাতেই কুলিয়ে যায়—রুচিরা বা সংক্ষেপে রুচির আর্ট স্কুলে পড়ার খরচাও তাতে মেটে। কলকাতায় রুচি মামার বাড়িতে থাকে—অতএব ওদিকের সমস্যা নিয়ে কৌশিক ঘোষকে ভাবতে হয় না।

তবু—তবু এই ভাবে কত দিন কাটবে ?

বেশ আছেন—সে কথা ঠিক। আজো দার্জিলিঙে জন-কয়েক অপরিচিত ভদ্রলোককে সে কথা তিনি শুনিয়ে এসেছেন উঁচু গলায়। তবু সব সময় জোর পান না। এক একদিন রাত্রে ঝর ঝর করে তীক্ষ্ণ শীতল বৃষ্টি নামে—বাইরে পাইন বনের ক্ষুব্ধ আলোড়ন বাজতে থাকে, বাংলো থেকে হাত ত্রিশেক দূরে মুখর হয় ঝর্ণাটা, বেবি কিংবা ডেভি ককিয়ে ওঠে একবার। তখন কেমন খারাপ লাগে কৌশিক ঘোষের। কী অসহ্য অন্ধকার—কী কালো অরণ্য—কী দুর্বহ নিবাসন! বইয়ের শেল্ফ-গুলোর এখানে-ওখানে ছায়ার পুঞ্জ যেন তাঁরই মনের সঞ্চিত রাশি রাশি অবসাদের মতো চোখের সামনে দুলতে থাকে।

তখন মনে পড়ে—কলকাতা থেকে কেন পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। ছিঃ—ছিঃ, কী লজ্জা—কী লজ্জা। কৌশিক সেটাকে ভুলতে চান—ভুলতে চানও না। আত্মপীড়নের একটা তিক্ত আনন্দ নিয়ে সেই দুঃস্বপ্নকে আস্বাদন করেন বার বার।

ওই একটি আঘাত! একটি আঘাতেই কী করে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে!

টেবিল থেকে তুলে নিলেন পাইপটা। একটা ইটালীয়ান কম্বল কুড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিলেন নিজের পায়ের ওপর। ধীরে

ধীরে পাইপ ধরিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন ল্যাম্পটার সেডের ওপরে বসে-থাকা গঙ্গা ফড়িংটার দিকে। তারপর—

রেঙ্গুনের কৌশিক ঘোষ অনেক করেছেন জীবনে। না—সে আদর্শ ভালো ছেলের জীবন নয়। তাঁর স্ত্রীকে তিনি সুখী করেননি—করতেও চাননি। কৌশিক ঘোষ জানতেন তিনি আগুন—তাঁর কাছে পতঙ্গেরা এসে পড়বে অনিবার্য নিয়মেই। চুম্বকের আকর্ষণে পিন আপনিই লাফিয়ে ওঠে—সে অপরাধ চুম্বকের নয়।

জীবন একটা ফুলের বাগান—তার চার দিকে থরে থরে ফুটে আছে ডালিয়া—গোলাপ-গন্ধরাজ! তুলে নিতে জানলেই হল। সমাজের মালী একজন আছে বটে, কিন্তু বুড়ো হয়েছে সে, চোখে ছানি পড়েছে তার। একটু বুদ্ধিমান যে—এমন মালিকে ফাঁকি দেওয়া কী আর শক্ত কাজ তার পক্ষে। বর্মী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী-বাঙালী—সব এক। দরকার শুধু একটুখানি হাতের কাজ। অন্তত কলকাতায় এসে বাসা বাঁধবার আগে পর্যন্ত এই ধারণাই তাঁর ছিল।

তাঁর নজর পড়ল রুচির প্রাইভেট টিউটারের ওপরে।

মেয়েটির বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি—স্কুলের টীচার। কিন্তু এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি এখনো মাস্টারনী হয়ে ওঠেনি—স্কুলের ছাত্রীর ছাপ রেখেছে মুখে। গলাটা এখনো মিষ্টি—হাসিটা তীক্ষ্ণ এবং উচ্ছল।

কৌশিক ঘোষ দেওয়ালের স্থির-চিত্ত টিক্‌টিকির মতো লক্ষ্য রাখছিলেন। একদিন রুচি গিয়েছিল নিমন্ত্রণে। একা বাড়িতে মাস্টারনীর সঙ্গে দেখা হল তাঁর।

কৌশিক ঘোষ সুযোগ ছাড়লেন না। নিজের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস তাঁর। তিনি জানতেন, তাঁকে আর খেলিয়ে তুলতে হয় না! পাকা হাতে শিকার উঠে আসে একটি হ্যাঁচকা টানেই।

ভণিতা বেশিক্ষণ করতে হল না। সূচনা করতেই উচ্ছ্বসিত গলায় হেসে উঠল মেয়েটি। বললে, আর বলতে হবে না—বুঝেছি।

কৌশিক ঘোষের খটকা লাগল। হাসিটা ঠিক ঠেনা কেল না।

কৌশিক বললেন, তা হলে চলো—কাল সিনেমায় যাই এক সঙ্গে।

মেয়েটি বললে, সে তো ভালোই—দু বছরের মধ্যে সিনেমা দেখিনি। কিন্তু কোন্ সীটে বসাবেন—ফার্স্ট ক্লাশে তো?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—একটু থতমত খেয়ে কৌশিক বললেন, শুধু ফার্স্ট ক্লাসে কেন, বেস্ট্ সীটে।

—তারপর বড় হোটেলে নিয়ে খাওয়াবেন তো? সেই রকমই তো রেওয়াজ।

কৌশিক সন্দিগ্ধবোধ করলেন।

—খাওয়াব বই কি। যেখানে খেতে চাও—যা খেতে চাও।

—তা হলে—মেয়েটি একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম করলঃ ওখানেই নিয়ে যাবেন কিন্তু। আমার একজন ক্লাস-ফ্রেণ্ডের কাছে শুনেছি ওরা সবচেয়ে ভালো ডিনার খাওয়ায়—আট-দশটা কোর্স। আমি কোনোদিন ওসব খাওয়ার সুযোগ পাইনি—চোখেই দেখিনি। নিয়ে যাবেন তো?

—তাই নিয়ে যাব।

—আর প্রেজেন্ট্ কী দেবেন? শুনেছি কেই ব্রোচ্ পায়, কেউ ইয়ারিং, কেউ শাড়ী, কেউ বা ঘড়ি। আমার ঘড়ি নেই, একটা ঘড়ি দেবেন তো?

কৌশিক ঘোষের কেমন গোলমাল বোধ হয়। মেয়েটিকে বেশ নিরীহ গো-বেচারী সাধারণ বাঙালীর মেয়ে বলে ভেবেছিলেন—একটু ডিগ্নিটিও আশা করেছিলেন বই কি। ভেবেছিলেন বাদামের মতো আস্তে আস্তে খোসা ছাড়াতে হবে। কিন্তু এ যে বলবার অগেই পা বাড়িয়ে আছে! আর শুধু পা বাড়ানো নয়—কী নির্লজ্জের মতো দর-দাম করছে। কৌশিক ঘোষ নিজেই লজ্জা পেলেন এবার।

বললেন, বেশ, তাই দেব তোমায়। শাড়ী-ইয়ারিংও দেব।

যেন চুক্তি-স্বাক্ষরিত হচ্ছে এমনি গম্ভীর হয়ে মেয়েটি বললে, কথা তা হলে পাকা ?

—নিশ্চয়ই।

—এর আর নড়-চড় হবে না ?

—কোনোমতেই না।

—ভালো করে বলুন।—মেয়েটির চোখ দুটো চক চক করে উঠল: গাছে তুলে দিয়ে আবার মই কেড়ে নেবেন না তো ? কাল সন্ধ্যেয় আপনার জন্যে সিনেমার সামনে আমি হা-পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে থাকব, অথচ শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন না—এমন একটা কিছু হবে না তো ?

—আজ অবধি কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ আমি ফেল্ করিনি।—কৌশিক ঘোষ মেয়েটির হাতের দিকে হাত বাড়ালেন। মেয়েটি হাত সরিয়ে নিল না—এমন কি, তিনি সে হাতে একটু চাপ দেবার পরেও না। অনেকক্ষণ পরে হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, তা হলে আমি আসি। কিন্তু কালকের কথায় যেন নড়-চড় না হয়।

সে-রাত্রে কৌশিক ঘোষ স্বাভাবিকভাবেই খেলেন, স্বাভাবিকভাবেই ঘুমুলেন। বুকের মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নেই—রক্তে কোনো উত্তেজনাও না। সে-সব পাট চুকে গেছে অনেক দিন আগেই। জঙ্গলের শিকারী যেমন ফাঁদে জানোয়ার পড়বার আওয়াজ পেয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যায়, তেমনি করে রাত কাটালেন—কাটালেন পরের দিনটাও।

একটু সেজেই বেরুলেন সন্ধ্যেবেলায়। কিছু বেশি টাকা নিলেন পকেটে। মেয়েটা এম্নি চেহারায় বেশ ভালো মানুষ হলে কী হয়—আসলে পাকা খেলোয়াড়! কিছু না খসিয়ে ধরা দেবে না।

চৌরঙ্গীতে এসে যখন বিলিতী সিনেমার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন, তখন মেয়েটি লবিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য—সেই শাদা-মাটা শাড়ী নয়, বেশ সেজে এসেছে আজকে! একটু

প্রসাধনও করেছে মনে হচ্ছে যেন। সিনেমা-হাউসের এই নেশা ধরানো আলোয়, এয়ার-কনডিশনের এই মৃদু শীতলতার আমেজে, আর চারদিকের এই নানা রঙের ঝলকানির ভেতরে অনেক ছেলে-মানুষ দেখাচ্ছে ওকে—যেন দশ বছর বয়েস কমে গেছে।

মেয়েটাই এগিয়ে এল ওঁর দিকে।

—তবে সত্যিই এলেন!

—কথা দিয়েছি, আসব না?—অত্যন্ত মধুমাখা হাসি হাসলেন কৌশিক।

—আমার কিন্তু বড় ভয় করছিল।

—এর পরে আর করবে না।—কৌশিক নিবিড় প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন: দু-দিনেই আমাকে চিনতে পারবে।

তবে একটু দাঁড়ান, আলাপ করিয়ে দিই—। গীতা, এদিকে আয়—

কৌশিক চমকে উঠলেন। গীতা, আবার কে? আজকের সন্ধ্যায় এই মেয়েটির সঙ্গেই তাঁর একান্তভাবে আলাপ হওয়ার কথা—কোনো গীতা-গায়ত্রীর প্রশ্ন তো ছিল না।

রুচির টিউটারের সমবয়সী আর একটি মেয়ে এগিয়ে এল কোত্থেকে। কালো কট্কটে চেহারা—চোখে শেলের চশমা—কপালে ভ্রূকুটি।

মাস্টারণী হেসে বললে, গীতা—ইনি কৌশিক ঘোষ। দেখছিস কি চমৎকার লোক। আরে, মাথার পাকা চুল দেখেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বয়সে আমার আড়াই গুণ হলে কী হয়—মনে ওঁর রসের ঝর্ণা বইছে। বুড়ো হয়েও উনি তরুণ। আমাকে ভীষণ ভালোবেসেছেন। আরে—অবাক হচ্ছিস যে? ভারী প্রেমিক লোক—দ্যাখ্না যে বয়েসে লোকে নাতি-নাতনী নিয়ে সার্কাস দেখতে যায়—সেই বয়সে উনি আমাকে দেখাতে এনেছেন 'অ্যালোন উইথ্ ইউ'। শুধুই সিনেমাই দেখাবেন তা-ই নয়, তারপরে ডিনার খাওয়াবেন। কালকে প্রেজেণ্ট করবেন একটা দামী ঘড়ি, পরশু

শাড়ী আর ইয়ারিংও পাব। হিংসে হচ্ছে? কী করবি—বল্। পারিস তো তুইও একটা জুটিয়ে নে গীতা—ওঁর ওপর নজর দিস্‌নে। খবরদার—বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কিন্তু।

বলেই, সেই তীক্ষ্ণ উচ্ছলকণ্ঠে 'লবি' কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত কৌতুকের—নির্মল আনন্দের লহরিত হাসি। চারদিকের মানুষ চমকে ফিরে তাকালো তার দিকে।

আর কৌশিক ঘোষ? কী মারাত্মক একটা নাটকে কোন্ ভয়াবহ নির্বোধের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেটা আবিষ্কার করলেন। পকেটে রিভলভার থাকলে সেই মুহূর্তেই হয় মেয়েটাকে খুন করতেন, নইলে আত্মহত্যা করতেন তিনি।

কী করে যে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এখনো তা ভালো করে মনে পড়ে না। শুধু গীতাকেই যে ও কথাগুলো শুনিয়েছে তা নয়—আশপাশ থেকে বহু কৌতুকভরা চোখেরই ব্যঙ্গবাণ অনুভব করেছিলেন কৌশিক। তাঁর ট্যাক্সি যখন ভবানী-পুর পাড়ি দিচ্ছে, তখনো তাঁর মনে হচ্ছিল ওই হাসির শব্দটা পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে তাঁর!

কী নিষ্ঠুর—কী ভয়ঙ্কর মেয়ে! হাতের মুঠো থেকে সিনেমার টিকিট দুটো বের করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে টের পেয়েছিলেন—এবার থেকে তাঁর টিকিট্ কেনার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। ভয়াবহ আত্ম-দর্শন। বুড়ো হয়ে গেছেন কৌশিক ঘোষ—একেবারে দেউলে হয়ে গেছেন। আজকের রঙ্গমঞ্চে একমাত্র বিদূষক ছাড়া আর কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন তিনি?

কৌশিক ঘোষ আচ্ছন্নের মতো সোফার ওপরে এলিয়ে পড়লেন। নিজের অস্তিত্বের প্রধান পীঠস্থান থেকেই আজ তিনি বিকেন্দ্রিত, বিচলিত। জীবনের মালঞ্চে এই মুহূর্তে অসংখ্য ফুল ফুটছে—ভবিষ্যতেও ফুটবে। কিন্তু তারা আর ধরা দেবে না তাঁর হাতে। নিষ্ঠুর কৌতুকে হাতের কাছে নেমে এসেই রূপকথার চম্পা-পারুলের

মতো উঠে যাবে আকাশের দিকে। আর এই প্রহসন দেখতে যে দর্শকের দল জড়ো হয়েছে—কৌশিক ঘোষ শুনতে পাবেন তাদের হাসি আর হাততালির আওয়াজ।

এর পর ?

নিজেকে তো তাঁর বিশ্বাস নেই। লোভে বরাবর শান দিয়েই এসেছেন তিনি—কখনো তাকে খাপে পুরে রাখতে শেখেননি। অজীর্ণ রোগীর মতো আজও চারদিকের প্রলোভন তাঁকে ডাকছে, তার হাত থেকে তো আত্মরক্ষার উপায় নেই!

ভুল করবেন—জেনেশুনেও করবেন। তার বিনিময়ে এর চাইতেও যে ভয়াবহ অপমান আসবে না—সে কথাই বা কে বলতে পারে ?

অতএব নির্বাসন।

ছাউনি-হিল। এর চাইতে ভালো জায়গা কী হতে পারে আর ?

বাড়ী কিনেছিলেন এক কৌশিক ঘোষ—যিনি এখানকার পাইন বনের ভেতরে ক্ষুধিত চোখ মেলে ঘুরে বেড়াতেন—খুঁজতেন টুকরো টুকরো প্রেম-কাব্যের শ্লোক। কিন্তু পাকাপাকিভাবে যিনি বাস করতে এলেন—তিনি একটা নিবাপিত হাউই।

একরাশ বেদান্ত-দর্শন পড়বেন। আত্মশুদ্ধি কববেন। আর এখানকার নির্বারিত নির্জনতায় ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন অসহ্য অপমানে কলঙ্কিত সেই সন্ধ্যাটার কথা।

কিন্তু আজো তা পারলেন কই কৌশিক ঘোষ ? আজও মনের ভেতরে তারা একরাশ কৃমির মতো কিলবিল করে। অগত্যা দু-ঘণ্টা ধরে একটানা কঠিন কঠিন বেদান্তের বই পড়েন—পথেবেরিয়ে আসেন, মনে মনে আওড়াতে থাকেন: 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। আর তখনি হয়তো চোখে পড়ে তরুণী একটি পাহাড়ী মেয়েকে। মাথায় একটা ভারী বোঝা নিয়ে নামছে খাড়া-উৎরাইয়ের পথ—এক একটা ধাপ নামবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লোলিত হয়ে উঠছে উগ্র যৌবনশ্রী।—থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আবেগ ঠিকরে এসেছে গলার কাছে—বুকের মধ্যে শুনতে পেয়েছেন ঝড়ের ডাক।

বাড়ী ফিরেছেন সঙ্গে সঙ্গেই। দাঁড়িয়েছেন আয়নার সামনে। নিজের চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ—গ্র্যাণ্ড্ হোটেল উপন্যাসের সেই নর্তকীকে মনে পড়ে গেছে তাঁর। চুল সব শাদা হতে চলেছে, কিন্তু এখনো কেন মনকে বশ মানাতে পারছেন না তিনি ?

তবু চেষ্টা করছেন বইকি। এই পাঁচ বছরে সংযতও হয়েছেন অনেকখানি। সংযত হয়েছেন ? আবার ভুলতে চেষ্টা করেন মনের প্রশ্নটা। ভাবেন, এই বাংলোটি সবদিক থেকেই আদর্শ তাঁর পক্ষে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—ঘন পাইন বনের মধ্যে একেবারে বিচ্ছিন্ন। যদি এইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়—চাকরটা যদি বাড়ীতে না থাকে, তা'হলে হয়তো তিনদিনের মধ্যেও সে-খবর কেউ জানতে পারবে না !

হঠাৎ চমকে উঠলেন। কে যেন ডাকছে।

কেউ নয়—তাঁরি চাকরটা। বিকারহীন মুখে মনের কোন প্রতি-লিপি ধরা পড়ে না।

জানতে চাইল ঃ খাবার তৈরী হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দিয়ে দেব হুজুর ?

—আজ এই টেবিলেই নিয়ে আয়।—কম্বলটাকে পায়ের ওপর আরো খানিক নামিয়ে দিয়ে কৌশিক বললেন, এখন আর নিচে যেতে ইচ্ছা করছে না।

চার

অশোকের ঘুম ভাঙে খুব ভোরে—অন্ধকার থাকতেই। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই। এ যে কতদিনের অভ্যাস সে তার ভালো করে মনেও পড়ে না। খুব ছেলেবেলায় বাবা ঘুম থেকে ডেকে ওঠাতেন, মুখস্থ করাতেন স্তব, পঞ্চকন্যা আর দশমহাবিদ্যার নাম। তারপর এক্সারসাইজ্, তারপরে পড়া। বাড়ীর সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল, ভোরের আবছা আলোয় সেখানে পায়চারী করে করে পড়তে থাকত অশোক—অন্তত মাইল তিনেক হাঁটা হয়ে যেত তাতে। তারপর রোদ যখন ধারালো হয়ে উঠে চোখে মুখে ঘা দিত, তখন ঘরে ফিরে যাওয়ার পালা।

বাবা বলতেন, রোজ সূর্য ওঠার আগে সমস্ত কাজ শেষ করে পড়ায় যে মন দিতে পারে, তার উন্নতি ঠেকাতে পারে না কেউ। ছুনিয়ায় যারা বড় হয়েছে, তারা সবাই আর্লি-রাইজার। ছাখ না রবীন্দ্রনাথকেই। শান্তি-নিকেতনে পাখি জাগবারও অনেক আগে জেগে ওঠেন তিনি—তাঁর চোখের সামনেই আস্তে আস্তে শুকতারা ডুবে যায়। সকলের আগে তাঁর প্রার্থনা শেষ হয়ে যায়—ভারত-বর্ষের সব লেখকের আগে তিনি লিখতে বসেন। তাই তাঁব লেখাও সকলকে ছাড়িয়ে যায়। আর যারা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়? তারা বড় জোর কেরাণীগিরি পর্যন্ত এগোতে পারে, ত্রিশ বছরে তাদের ক্রনিক্ ডিস্পেপ্সিয়া হয় আর চল্লিশ বছরে হয় ডাইবেটিস্। তারা শুধু সংখ্যাই বাড়ায়—মানুষ বাড়াতে পারে না একটিও।

প্রাতরুত্থানের এত গুণ? শুনে রোমাঞ্চ হয়েছে অশোকের। মনে মনে কল্পনা করেছে সে-ও তাহলে নির্ঘাৎ রবীন্দ্রনাথ হবে একদিন। একটু বয়েস বাড়লে ছু'চারটে কবিতা লিখেছে—ছাপাও হয়েছে কাগজে। আই-এস্সি পড়বার সময় তো দস্তুরমতো আধুনিক একটা সাহিত্য গোষ্ঠীতে গিয়ে ভিড়েছিল, মনে হয়েছিল তাদের

ওপরেই সাহিত্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। ছন্দের ওপরে রোলার চালিয়ে, 'মাতরিশ্বা দিন' 'অনিকেত প্রেম' 'বিপ্রকর্ষ বিবিক্ষু আত্মা' আর 'তবুও হটেনটট্ আকাশের বৈমনস্য অনুকৃত দূর পার্থেননে' এইসব লিখে পাঠকদের যেমন চকিত করেছিল, উচ্চকিত নিজে হয়েছিল তার চাইতেও বেশি। ঘরের দেওয়ালে বোদ্‌লেইরের এই পংক্তিগুলো তার টাঙানো থাকত: "No cherchez plus mon coer ; les fetes l'ont mange." 'অর্থাৎ আমার হৃদয়কে আর খুঁজোনা ; বুনো জন্তরা তাকে খেয়ে ফেলেছে।'

রবীন্দ্রনাথ নয়—ওটা ব্যাক্-ডেটেড্। রবীন্দ্রতর কিছু হওয়া চাই। হয়তো হয়েও যেত, যদি না নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা হোঁচট্ খেতো বি-এস্-সি প্র্যাক্টিক্যালে। বাবা ক্ষেপে গেলেন। ভবিষ্যতে যে দিকপাল হবে, সে-কিনা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভিড়ল ফেল করা ছাগপালের সঙ্গে! বাবা বললেন, এমন গর্দভ ছেলেকে পড়ার খরচ জুগিয়ে তিনি তাঁর 'হার্ড-আর্নড্ মানি' অপচয় করতে রাজী নন। যে-সব মাসিক পত্রিকায় ডজন ধরে সে পাগলের প্রলাপ লিখে থাকে, তার সেই পাগ্‌লা গারদের বন্ধুরাই তবে তার পড়ার খরচ যুগিয়ে যাক।

তারা যোগাবে খরচ! তাদেরই অনেকের খরচ যোগাতে হয় অশোককে! একবার মনে মনে দস্তুরমতো বিদ্রোহ জেগে উঠল তার, ভাবল সব ছেড়ে সাহিত্য-সাধনায় লেগে যায়। কিন্তু তাতেও মন সাড়া দিল না। চোখের সামনেই এম্‌নি একটি আত্মত্যাগী বন্ধুকে দেখেছে সে। সাহিত্যের জন্যে বাড়ীঘর সব ছেড়েছে—শুধু ছাড়েনি ধার করাটা। ছোকরার লেখার হাত ভালো, তার চেয়ে হাত আরো ভালো পরের টাকা আর জিনিশ-পত্র মেরে দেবার। অশোকেরই একটা সখের কলম বেমালুম বিক্রী করে দিয়েছে। উপায় কী, বায়ু-ভক্ষণ করে তো আর সাহিত্য-চর্চা হয় না!

তার অবস্থা দেখেই হয়ে গেছে অশোকের। তিন দিন অত্যন্ত চটে থেকে, গোটা তিনেক আরো দুর্বোধ্য কবিতা লিখল সে। সে কবিতা এজ্‌রা পাউণ্ড্‌কেও চম্‌কে দেবার মতো। ডাডায়িস্ট্‌দের উদ্দেশে কবিতাগুলো সে উৎসর্গ করল, তারপর সোজা হেঁটে গিয়ে *পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে একটা পরীক্ষা দিয়ে বসল।*

ঝর্‌ঝরে ইংরেজী, ঝক্‌ঝকে মেধা, প্রচুর পড়াশোনা। অশোক পাশ করল ভালো করেই। চাকরীও জুটল একটা। বাবা বিদ্রূপ মুখে বললেন, শেষকালে পোস্ট্‌-অফিসে! কোনো ফিউচারই নেই। তবু লেগে থাক। ও-সব যাচ্ছেতাই পদ্য লেখা বন্ধ করে যদি মন দিয়ে একজামিনগুলো পাশ করতে পারিস, তবে চাই কি একদিন পি. এম. জি হয়ে যাবি!

পি-এম-জি!

অশোকের হাসি পেলো। বাবা কখনো হাল ছাড়েন না, তাঁর নজর সব সময়ে আকাশের দিকে। কিন্তু চাকরীতে ঢুকে তাকে কবিতা আপনিই ছাড়ল। কিছুদিন শিক্ষানবিশীর পরেই তাকে এক এক ধাক্কায় এমন এক একটি পোস্ট্‌-অফিসে পাঠাতে লাগল, যেখানে বোদ্‌লেইর তো দূরে থাক, সময় কাটাবার জন্যে একখানা চলনসই পত্রিকা পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। ডাকে সেখানে সাপ্তাহিক আর অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা আসে, বই যা আসে তা পঞ্জিকার পাতা থেকে সংগৃহীত উপন্যাস আর যৌনতত্ত্ব।

ভিজে সল্‌তেয় আগুন আর কতদিন জ্বলে? কিছুদিন চেষ্টা করে অশোক হাল ছাড়ল। নিজে যা রোজগার করে, তা থেকে কিছু কিছু বই আগে কিনত—বাবা রিটায়ার করার পরে তা-ও আর হয়ে ওঠে না। হাজার প্রাতরুত্থানের অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও সে ভদ্রলোক কিন্তু আড়াইশো টাকার কেরানীগিরির ওপরে আর উঠতে পারেননি!

পড়া গেল—লেখা গেল। তারপর একদিন অশোক আবিষ্কার করল বাংলা কবিতার মোড় ফিরে গেছে। এমন একটা সুর

তাতে এসেছে—যা তার চেনা নেই। অশোক তার সঙ্গে মানাতে পারল না মনকে—খাপ খাওয়াতে পারল না কলমকে। সুতরাং যথানিয়মে আরো অনেকের মতোই বাঙালী পাঠকের কাছে অশোকের স্বল্প-পরিচিত নাম চিরদিনের মতো মুছে গেল।

আগে অল্প-সল্প দুঃখ হত—এখন আর তা হয় না। নিজের লেখার কথা ভাবলে হাসি পায় এখন। শুধু কখনো কখনো মনে হয়, কাজকর্মের ফাঁকে একটা উপন্যাস লিখে ফেললে মন্দ হয় না। এই ছাউনি-হিলকেই গল্পের পটভূমি করা যাক—কৌশিক ঘোষকে করা যাক তার নায়ক। কিন্তু তাও হয়ে ওঠে না। এতদিন ধরে অশোক এই সত্যকে নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করেছে যে, যারা বলে নির্জনতাই সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল, তারা মিথ্যে কথা বলে। নির্জনতা সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয় না—তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে, ডুবিয়ে দেয় একটা শিথিল অবসাদের ভেতরে। নাচ শুরু করতে হলে চাই অর্কেস্ট্রা, তারই তালে তালে দুলে উঠবে শরীর—ঘূর্ণি জাগবে রক্তে। তেমনি চারপাশে জীবনের দশটা বাদ্যযন্ত্রে যদি ঝঙ্কার ওঠে, তবেই মনের ভেতরে উদ্বোধিত হয়ে ওঠে সৃষ্টির নটলীলা। কিংবা আগে জীবনের তারগুলোতে এসে বাইরের আঘাত লাগুক—তারপরেই গান বাজবে।

না—নির্জনতায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। হয়তো একমাত্র বিভূতিভূষণ লিখতে পারেন 'পথের পাঁচালী', কিন্তু ও-কাজ অশোকের নয়। ও-রকম শান্ত রসের কারবারে তার রুচি নেই—তার ঝড়ের ডাক চাই। অনেক চঞ্চল মনের ছোঁয়া না লাগলে তার মনে ঢেউ ওঠে না।

তাই অশোক এখন প্রায় পুরোপুরিই পোস্ট্-মাস্টার। আগে নানা উন্নাসিকতাই ছিল—লোকের সঙ্গে মিশতেই পারত না। এখন প্রসন্ন ঔদার্য এসে গেছে। সকলের সঙ্গে সহজ হতে পারে, সকলকে সয়ে যায়। কানের কাছে অদ্ভুত ধরণের সাহিত্য-আলোচনা শুনেও তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় না। যে যা

নিয়ে খুশি থাকতে চায় থাকুক—গায়ে পড়ে মানুষকে ঘা দিয়ে লাভ কী? আর দেশের এই সব নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির সাধারণ মানুষকে নিয়েই যখন তাকে দিন কাটাতে হবে, তখন কেন আর নিজের চারদিকে অসামান্যতার গণ্ডী টেনে রাখা!

আজও ভোরের আলোয় গায়ে একটা লম্বা কোট চাপিয়ে পোস্ট অফিসের সামনের রাস্তায় অশোক পায়চারী করছিল। দূরে পাহাড়ের মাথাগুলো লাল হয়ে উঠেছে, এদিকে পাইন বনের ওপরে একটুখানি ছায়া পড়েছে তার—যেন কালো মেঘের কোণায় রোদের রঙ্। ও-দিকে একটা চা-বাগান নেমেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে—তার উপর কুয়াসা ভেসে বেড়াচ্ছে। চা-বাগানটাকে দেখাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড মৌচাক, আর এক ঝাঁক মৌমাছির মতোই কুয়াসাটা চক্র দিয়ে ফিরছে তার ওপরে।

অশোকের মনে কবিতা গুন্ গুন্ করতে লাগল। এখনো করে মধ্যে মধ্যে। লেখা ছেড়ে দিয়েছে—সম্পূর্ণ করে আসে না। ভেসে বেড়ায় টুকরো হয়ে।

অশোক আওড়াতে লাগল ঃ

একটি প্রবালদ্বীপ কাল রাতে জন্ম নিলো দক্ষিণ সাগরে
হে সূর্য দিয়েছ তারে রক্তিম-চুম্বন—
সমুদ্র-বাসর থেকে যে-শঙ্খ শোনালো বার্তা তার
হে সূর্য আমার রক্তে অনিকেত সেই প্রেম দাও—

—নমস্কার!

চকিত হয়ে ফিরে তাকালো অশোক।

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে—প্রকাণ্ড ওভার-কোট তার গায়ে। ভাব দেখে মনে হয় যেন দক্ষিণ মেরুতে সীল মাছ শিকার করতে এসেছে। সঙ্গে বছর কুড়িকের একটি মেয়ে—তারও গায়ে ফিকে-নীল রঙের লম্বা কোট। মেয়েটির চশমার কাচে রোদের রক্তিম আভা পড়েছে—মুখে যেন আবির ছড়িয়ে রয়েছে এক রাশ।

অশোক হেসে প্রতি-নমস্কার জানালো।

ছেলেটি বললে, আমরা—

অশোক বললে, জানি। বারো নম্বর বাংলোয় উঠেছেন আপনারা। ডক্টর চক্রবর্তীর বাড়ীতে।

—ও। তা হলে—

—হাঁ, কালকে সন্ধ্যেবেলাতেই দেখা হল আপনাদের সঙ্গে। অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—অশোক হাসল : বাড়ীটা ঠিক মতো খুঁজে পেয়েছিলেন তা হলে ?

—তা পেয়েছিলাম। আপনারা না থাকলে আরো কতক্ষণ যে ঘুরে মরতে হত কে জানে ? যা অন্ধকার আর জঙ্গল চার-দিকে ! একবার তো ভাবছিলাম, দূর ছাই, গাড়ী ঘুরিয়ে শিলি-গুড়িতেই ফিরে যাই আবার।

—আশা করি, অত ভীতিপ্রদ আর লাগছে না এখন ?—অশোক আবার হাসল ! ছেলেটিকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি মেয়েটির মুখের ওপরে গিয়েই পড়ল। শ্যামবর্ণের দীর্ঘ চেহারার মেয়ে, সুন্দরী না হলেও দীপ্তিমতী, চোখ ছুটি উজ্জ্বল। অশোকের একবার মনে হল, চশমাজোড়া এই মেয়েটির চোখে একেবারেই যেন মানায়নি।

জবাব মেয়েটিই দিলে।

—না, সকালটাকে নেহাৎ মন্দ লাগছে না। এমন কি, বেশ ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

—তা হলে থাকবেন দিন কতক ?

—সেটা নির্ভর করে এখানে যে রকম প্রতিবেশী পাওয়া যাবে, তার ওপর।

অশোক বললে, ওটা উভয়ত। আমাদের সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমরা কেউ সুজন না হলেও ছুর্জন নই অন্তত। আমাদের সঙ্গে যাঁরা থাকতে এসেছেন, তাঁদের কথা আমরা এখনো কিছুই জানি না।

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করলে।

—তার মানে কি বলতে চান যে আমরা খারাপ লোক হলেও হতে পারি ?

আবহাওয়াটা কেমন যেন বেসুরো হয়ে উঠতে চাইল। ছেলেটি একটা ছোট ধমক দিয়ে বললে, বুলু !

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে অশোক সবটা সামলে নিতে চাইল : না—না, উনি আমার কথাটা ঠিক বুঝেছেন। এখানে কোন চেঞ্জার এলে আমরা স্থানীয় যারা, তাঁদের টেস্ট্ করে দেখি। পরীক্ষায় যদি তাঁরা উতরে যান, তখনই তাঁদের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকি।

—সে পরীক্ষাটা কি করম ?—মেয়েটির মুখে তখনও ভ্রূকুটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

—আমরা গিয়ে দল বেঁধে তাঁদের বাড়ীতে হানা দিই। অর্থাৎ সে-বাড়ীতে নিজেরাই নিজেদের নিমন্ত্রণ করি। যদি তাঁরা কিছুই না খাওয়ান, বুঝে নিই—দুর্জন ; যদি শুধ্ এক কাপ চা খাইয়েই বিদেয় করেন—বুঝে নিই লোক সুবিধের নয়। যদি চায়ের সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট পাই—বুঝে নিই, চলনসই। আর যদি—

—আর যদি ?—মেয়েটির মুখ হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠছিল এবার। পাইন বনের ওপরে সূর্য এবার সোনালি আলো ছড়িয়েছে—সে আলো মেয়েটির চোখে-মুখে এসেও পড়েছে। বুলু নামটি এই মুহূর্তে বড় ভালো লাগল অশোকের ; ভারী সহজে—বড় অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করা যায়—চিত্রা-সুচিত্রার মতো হোঁচট খেতে হয় না।

অশোক বললে, বুলু দেবী, বাকীটা সহজেই অনুমান করতে পারেন। যদি দেখি, শুধু চা-বিস্কুটই নয়, তার সঙ্গে লুচি, ডিম আর আলু-ভাজা আসছে, তা হলে আমরা সমস্বরে বলতে থাকি, এমন চেঞ্জার ছাউনি-হিলে আর কোনোদিন আসেনি, কোনোদিন আসবেও না।

এইবারে তিনজনেই হেসে উঠল। চকিতে নির্মল আর প্রসন্ন হয়ে উঠল সকালটা।

ছেলেটি বললে, বেশ তো চলুন তা হলে আমাদের ওখানেই। পরীক্ষা হয়ে যাক।

অশোক বললে, উঁহু, আমি একা নই। এখানে আমরা সবাই মিলে ওটা করি—কাজেই সকলের সঙ্গেই হবে। তার আগে আপনাদের পরিচয়—

—ঠিক কথা, ওটা শুরুতেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। আমি অনুপম রায় চৌধুরী—কেমিস্টের কাজ করি। আর এ আমার বোন বুলা—এ বছর সিক্‌স্‌থ্‌ ইয়ারে উঠেছে।

অশোক বললে, আর আমি অশোক মুখুজ্জে। আমার কাছে রোজ আপনাদের আসতে হবে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আমি এখানকার পোস্ট মাস্টার।

—ওইটে বুঝি আপনার পোস্ট অফিস ?

—ঠিক চিনেছেন। তবে ওর চেহারা দেখে করুণাবোধ করবেন না। আমার এখান থেকে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের পর্যন্ত বন্দোবস্ত আছে।

সত্যি নাকি ?—বুলা বললে, তবে তো ভালোই হল। দরকার হলে জলপাইগুড়িতে ফোন করা যাবে।

—তা যাবে। কিন্তু এতদূর যখন এলেন-ই একবার পায়ের ধূলো দিন না আমার ওখানে।

অনুপমের আপত্তি ছিল না, একবার বুলার দিকে তাকালো সে। বুলা বললে, আপনার কাছে নিজেদের গরজেই তো আসতে হবে সব সময়ে। আজ থাক। আপনিই বরং চলুন না আমাদের বাংলোয়। চা খাব এক সঙ্গে।

—সর্বনাশ! সকলকে বাদ দিয়ে ? তা হলে এখানকার কেউ আমায় আস্তো রাখবে না। ওই দেখুন না—আর একজন এসে পড়েছেন।

এদিকে একটা ছোট পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে নামছিলেন শৈলেশ। পরণে লুঙ্গি—গায়ে আলোয়ান, পায়ে চটি জুতো, হাতে দাঁতন।

—শৈলেশদা !—অশোক ডাকল।

একবার এদিকে তাকিয়েই শৈলেশ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেই পথেই ফিরে যেতে যেতে বলে গেলেন, আসছি একটু পরে।

বুলা বললে, ওকি! উনি পালালেন কেন?

অশোক হাসছিল: লুঙ্গি পরে আলাপ করবেন একটি মহিলার সঙ্গে? সেই লজ্জা ঢাকবার জন্যেই ফিরে গেলেন।

অনুপম হেসে বললে, এখানেও এ-সব ফর্মালিটি আছে নাকি আপনাদের?

—নিজেদের ভেতর কিছু নেই। এখানকার রোমে আমরা সবাই রোম্যান। তবে বাইরে থেকে কেউ এসে আমাদের একেবারে বর্বর না ভেবে বসেন সে জন্যে একটু সাবধান থাকতে হয় বই কি।

কথা বলতে বলতে তিন জনেই এগিয়ে চলেছিল। প্রথম আলোয় ছাউনি-হিলকে সত্যিই আর খারাপ লাগছে না। অকুণ্ঠ উদার প্রকৃতি চারদিকে। ঘন নীল পাহাড় আর নিবিড় সবুজ অরণ্য। ঠিক মুখোমুখি দূরের একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় দু-টুকরো শাদা মেঘ যেন ঘুমিয়ে আছে—রোদের আলোয় উজ্জ্বল রেশমী রঙ ধরেছে তারা। গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে লাল রঙের বাংলোগুলো ছবির মতো সাজানো—বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপের মতো মনে হয় তাদের। পথের দু-ধারে অজস্র পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। রাস্তার ধূলোর ওপর কালো-হলদে রঙের একদল চাতক পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে ধূলিস্নান করছে।

অনুপম বললে, সত্যিই লাভ্‌লি জায়গা।

বুলা সায় দিলে, বাস্তবিক। সারা জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে এখানে।

অশোক বিব্রতভাবে হাসল: সে সারা জীবন সাত দিনের বেশি নয়। তার পরেই পালাতে চাইবেন।

বুলা বললে, নির্জনতা আমার ভালো লাগে।

অশোক বললে, কিছু মনে করবেন না, একটা উপমা দেব। সে ভালো-লাগাটা কি রকম জানেন? দুবেলা যারা নিয়মিত ভালো জিনিশ খায়, তাদের একদিন চাল-ছোলা ভাজা খেয়ে মুখ বদলানোর মতো। কোনোটাই বেশিদিন বরদাস্ত হয় না—নির্জনতাও নয়, ছোলা-বাদামও না।

অনুপম বললে, খুব ক্ষেপে গেছেন মনে হচ্ছে।

—ক্ষেপিনি, আত্ম-দর্শন হয়েছে। বন-জঙ্গল সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে রোম্যান্টিক—যারা কখনো একটা সন্ধ্যাও জঙ্গলে কাটায়নি। যদি টেরাইয়ের কোনো ভয়াবহ ফরেস্টে একটা ছোট ডাক বাংলোয় একটিমাত্র রাত তাদের থাকতে হত, যদি বাইয়ে থেকে আসত হাতীর ডাক আর বাঘের গায়ের গন্ধ, তা হলে—

মাঝখান থেকে কথাটা কেড়ে নিলে বুলা: আমি গিয়ে সোজা হাতীর পিঠে চেপে বসতাম।

অশোক কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুলার তত্ত্বের দিকে মন ছিল না। একটু দূরেই একটা বুনো লতা থেকে একগুচ্ছ বেগুনী ফুল নিচে ঝুলে পড়েছে, বুলা সেদিকেই এগিয়ে গেল।

—কী চমৎকার ফুলগুলো!

অশোক ত্রস্ত হয়ে বললে, যাবেন না—যাবেন না!

বুলা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কেন, কী হয়েছে?

—এখানে ঘাসবনের ভেতর জোঁকের উৎপাত।

—জোঁক! কী সর্বনাশ!—বুলা লাফিয়ে উঠল, সভয়ে তাকালো পায়ের দিকে: ধরেনি তো! জোঁককে আমি ভীষণ ভয় পাই।

অশোক হা-হা করে হেসে উঠল।

—দেখলেন তো? এখানে সারা জীবন থাকার মোহটা কী ভাবে প্রথমেই হোঁচট খেলো একটা?

বুলা বললে, জোঁক ভারী বিশ্রী জিনিশ। মামাবাড়ীতে একবার

একটা ধরেছিল আমাকে। সেই থেকে জোঁক দেখলেই গা শির শির করে আমার। অনেক আছে বুঝি এখানে ?

—অঢেল্। একটু বর্ষার জল পড়লে তো আর কথাই নেই—চারদিক থেকে লিক্ লিক্ করে ওঠে।

—ও।—বুলা চুপ করে গেল।

অনুপম বললে, ভয়ানক দমে গেলি যে। জোঁকের ভয়ে একেবারে মিইয়ে গেলি দেখছি।

বুলা বললে, মোটেই নয়। আমার ওই ফুলগুলো নিতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে।

অশোক বললে, তবে দাঁড়ান—আমি এনে দিচ্ছি।

বুলা বললে, আপনাকে জোঁকে ধরবে না ?

অশোক হেসে বললে, না। ওরা আমাদের পোষা।

অশোক একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এল।

বুলা বললে, কী সুন্দর—কী মিষ্টি দেখতে !—মুখের কাছে ফুলগুলোকে এগিয়ে এনে বললে, কিন্তু কোনো গন্ধ নেই তো।

—ওটা পাহাড়ী ফুলের সাধারণ নিয়ম। ঠিক পাহাড়ের মতোই। বাইরেটা সহজেই দেখা যায়, কিন্তু ভেতরের খবর কিছুতেই মেলে না।

—তাই নাকি ?—বুলা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সামনের বাঁক ঘুরে দেখা দিলেন কৌশিক ঘোষ। সার্টের ওপরে মোটা শাদা স্লিপ-ওভার, পরণে ফিকে ছাই-রঙের ট্রাউজার—হাতে একটা মোটা লাঠি। ছুটো ঠোঁটে চুরুটটা চেপে ধরে ধূমায়িত ছন্দে এগিয়ে আসছেন। এদের দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অশোক বললে, এইবার আমাদের ছাউনি-হিলের গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা—কৌশিকরঞ্জন ঘোষ—আমাদের দাছু। আমাদের ভালো-মন্দ সুখ-তুঃখ সব কিছুর তত্ত্বাবধান উনিই করেন। আর এঁরা হচ্ছেন অনুপমবাবু আর বুলা দেবী—ভাই-বোন—বারো নম্বর বাংলোয় উঠেছেন।

অনুপম হেসে বললে, নমস্কার দাতু। এখন আমরা আপনারই অতিথি। আমাদের ভালো-মন্দের দিকেও কিছু কিছু নজর দিতে হবে আপনাকে।

একবারের জন্যে কৌশিক ঘোষের মুখের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া ভেসে গেল একটা। এই দাতু ডাকটা অনেক দিন ধরেই তিনি শুনেছেন—গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান কথাটাও এতদিন তার খারাপ লাগেনি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল ঠিক এই সময়েই ও-কথাটা না বললেও যেন ক্ষতি ছিল না।

পরক্ষণেই মুখের ওপর প্রসন্নতা টেনে এনে কৌশিক বললেন, আমি আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।

বুলা বললে, সে তো সৌভাগ্য—চলুন। কিন্তু দাতু, আমাদের আর 'আপনি' বলে পর করে রাখা কেন? তুমি বলেই ডাকবেন।

দাতু! আর একবার ছোট্ট একটা কাঁটার খোঁচা খেলেন কৌশিক ঘোষ। তারপরেই সহজ হয়ে বললেন, বেশ—বেশ, তাই হবে।

মনের দিক থেকে কেমন নিরুৎসাহ বোধ করল অশোক। এতক্ষণ নেহাৎ মন্দ লাগছিল না—অনুপম সঙ্গে থাকতেও বুলার সঙ্গে যেন একটা ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তার। কিন্তু মাঝখানে এসে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে রসভঙ্গ করলেন কৌশিক।

অশোক বললে, তা হ'লে এবার আমি ফিরি।

অনুপম বললে, ফিরবেন কেন—আসুন না। ওই তো বাংলো দেখা যাচ্ছে আমাদের।

অশোক বললে, না—না থাক, আমার কাজ আছে।

বুলা হাসল: ওঃ, সেই—ভয়? কিন্তু এখন আর ভাবনা কি আপনার? সঙ্গে তো দাতুই রয়েছেন। দাতু একাই মেজরিটি—সুতরাং—

—কিন্তু আমার একটু কাজ আছে যে—

—কাজ আবার কী?—বুলা ভ্রূভঙ্গি করলে: আপনার পোস্ট

অফিসের চেহারা তো দেখেই এসেছি। নিন্—চলুন, পাঁচ মিনিট বসবেন।

অগত্যা। বুলার চোখের দিকে একবার চোখ পড়ল অশোকের: চলুন।

সত্যিই সামনে বারো নম্বর বাংলো। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে খানিকটা পাথর-বাঁধা পথ বাড়ীটার গেটের দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা পাথুরে হলেও চাওড়া—একখানা গাড়ী স্বচ্ছন্দে যেতে পারে তার ওপর দিয়ে। যুদ্ধের সময় এখানে বাস করতে এসে মনের মতো করে বাড়ীখানাকে সাজিয়েছিলেন ডক্টর চক্রবর্তী। নানা রকম ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন, পুঁতে দিয়েছিলেন আপেল আর কমলালেবুর চারা। ফুলগাছগুলো কিছু কিছু টিকে আছে এখনো—বাঁচিয়ে রেখেছে কিপারটা। আপেল আর কমলালেবুর গাছ দুটো বেশ বড় হয়েছে এতদিনে। আপেল হয়, কিন্তু ভয়ঙ্কর টক—একমাত্র কীপারের সর্বভুক ছেলেটা ছাড়া আর কেউ দাঁত দিয়ে কাটতে পারে না। লেবুগুলো মিষ্টি। এখনো ফল ধরেনি—ফুলে ফুলে মনোরম হয়ে আছে।

তিনজনে যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন, তখন সামনের লনে, দু'পাশে ফুটন্ত মরশুমী ফুলের ভেতরে খানকয়েক বেতের চেয়ার পড়েছে। একটি প্রৌঢ়া আর একটি আধ-বয়েসী মহিলা সকালের মিষ্টি রোদে বসে আছেন সেখানে। মাঝ-বয়েসী মহিলাটির পাশেই মাটিতে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা উলের গুটি—কি যেন বুনে চলেছেন তিনি।

অনুপম পা দিয়েই ডাকল: মা—মাসীমা এঁরা দেখা করতে এসেছেন।

দুটি মহিলাই চকিত হয়ে উঠলেন—যিনি উল বুনছিলেন, তিনি ঘোমটাটাকে একটুখানি টেনে দিলেন মাথার ওপরে। প্রৌঢ়া বললেন, আসুন—আসুন।

অনুপম প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললে, আমার মা। ইনি মাসীমা। আর এঁরা হচ্ছেন কৌশিক ঘোষ—

বুলা বললে,—এখানকার দাহু। গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ম্যান।

কৌশিক হাসতে চেষ্টা করলেন। মেয়েটাও তো আচ্ছা! ওই শব্দ দুটোকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না!

অনুপম বললে, ঠিক কথা—উনি এখানকার দাহু। সকলের অভিভাবকই বলতে গেলে। আর ইনি অশোক মুখুজ্জে—পোস্ট্ মাস্টার।

অনুপমের মা বললেন, ভারী খুশি হয়েছি—আপনারা এসেছেন বলে। এতো একেবারে নির্বান্ধব দেশ। আপনাদের ভরসাতেই থাকা। ওকি—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন।

কৌশিক শব্দ করে বসে পড়লেন। অশোক আসন নিলে সসঙ্কোচে।

বুলা বললে, শুধু ওঁদের বসালে তো হবে না মা, আমি ওঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করে এনেছি কিন্তু।

মা বললেন, এখানে আর নেমন্তন্ন! পাওয়াই বা যায় কী—খাওয়াবিই বা কী!

বুলা একবার তির্যক ভঙ্গিতে অশোকের দিকে তাকালো: কিন্তু তাই বলে শুধু চা খাইয়েই পার পাবে না মা। যে শুধু এক পেয়ালা চা খাওয়ায়, ওঁরা মনে করেন সে অত্যন্ত খারাপ লোক—ভবিষ্যতে তার ত্রিসীমাও মাড়ান না ওঁরা।

অশোক লজ্জিত হল: আমি বুঝি তাই বলেছি?

—তাই বলেননি?—বুলা হেসে উঠল: আপনার কথার এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ হওয়া তো সম্ভব নয় অশোকবাবু!

বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দিলে অনুপম: কী বাজে কথা আরম্ভ করলি বল্‌তো! চট্‌পট ভেতরে যা—ওঁদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে আয়।

বুলা চলে গেল।

একবার বুলা, আর একবার অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কৌশিক। অনেক দূর থেকে আসা বাঁশির সুরের মতো কী

একটা যেন শুনতে পেলেন তিনি মুহূর্তের জন্যে। সেটা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তার অর্থ টা কারো কাছে ধরা দেয়নি এখনো, অথচ—

কৌশিক ঘোষের মনে হল, আজ সকালে এখানে না এলেই তিনি ভালো করতেন।

অনুপমের মা বললেন, আমরা দু'জনে এখানে বেশি দিন থাকব না, দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাব। থাকবে ছেলে-মেয়ে দুটো। আপনারাই দেখা-শোনা করবেন।

কৌশিক একবার অশোকের দিকে তাকালেন। সূর্যের আলোয় অনেক বেশি যেন উজ্জ্বল দেখালো অশোকের মুখ। নাকি ওটা তাঁরই চোখের ভুল ?

অনুপম কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ ডাকল : দাদু ?

কৌশিক চমকে উঠলেন।

—কী বলছিলেন ?

—আবার বলছিলেন কেন ?—অনুপম হাসল : দাদু যখন একবার পাতিয়ে নিয়েছি, তখন সত্যি সত্যিই দাদু। আমাদের এবার থেকে নাম ধরে ডাকবেন—ভয়ানক রাগ করবো নইলে।

জোর করেই অস্বস্তিভরা হাসি কৌশিক মুখের ওপরে টেনে আনলেন : আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে।

অনুপম বললে, আমি ভাবছিলাম, ইন্‌ডিজেনাস্ ড্রাগের কথা।

—কি রকম ?—অশোক আর কৌশিক উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন একসঙ্গেই।

—আমাদের দেশে অনেক দুর্লভ গাছপালা রয়েছে, যাদের নিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত কোনো রিসার্চ হয়নি। যেমন ধরুন 'সর্পগন্ধা'—সবে আমাদের চোখ পড়েছে তার ওপর। এ-রকম বহু রয়েছে এখনো। এগুলো নিয়ে গবেষণা করলে অনেক দুর্মূল্য জিনিশ আবিষ্কার করা যেতে পারে। অথচ সম্রাট হিমালয়ের ভাণ্ডার আজ পর্যন্ত মানুষের একেবারে আচেনা। আমার ইচ্ছে, হিমালয়ান-হার্বস্ নিয়ে কিছু কাজ করি।

—সে তো চমৎকার কথা।—কৌশিক চকিত হয়ে উঠলেন।

অনুপম উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, সেইজন্যেই ছাউনি-হিলে এসেছি—নিছক বেড়াতে নয়। আর আমার বোন বুলাও এম এস্-সি পড়ছে, ওরও বেশ কৌতূহল আছে এসবে। কিছু করতে পারা যাবে মনে করেন ?

এবার উৎসাহের পালা আশোকের।

—কেন যাবে না ? এই পাহাড়ীরাই কত জরি-বুটি শিকড় বাকড়ের সন্ধান রাখে। সব সময়েই কি আর ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটি করে ওরা ? কত জিনিশ আছে—কত করবার আছে। লেগে পড়ুন—যথাসাধ্য সাহায্য করব আমরা।

এই কথাটা তিনিও বলতে পারতেন—ভাবলেন কৌশিক। কারণ সেই মুহূর্তেই দুটো খাবারের প্লেট হাতে করে বুলা এসে দাঁড়াল।

পাঁচ

বীর বাহাদুর সকাল সকাল ডাক এনেছে আজ।

বাসের আসল মালিক হলেন লামা সাহেব—এ অঞ্চলের ছোট-খাটো জমিদার একজন। লোকটি তিব্বতী—বহুকাল এ-দেশে আছেন, তবু পুরোপুরি এ-দেশের সঙ্গে মিশতে পারেন নি। জাতিতে বৌদ্ধ—অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। তাঁর পূজোর ঘরে অসংখ্য বৌদ্ধ-দেবদেবীর ছবি, সারি সারি পুঁথি আর বিচিত্র মূর্তি-গুলোর সমাবেশ দেখলে মনে হয় যেন তিব্বতের কোনো বৌদ্ধ-মঠের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এটা।

শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক লামা সাহেব। কারো সঙ্গে উপযাচক হয়ে মেশেন না; বিশাল তরী-তরকারী আর আপেলের বাগান, মৌমাছির চাষ আর চা-বাগানের কিছু শেয়ারের মধ্যেই তাঁর দিন কাটে। আশেপাশে এই যে চেঞ্জারেরা আসে যায়, তাদের কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। নিজের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ।

ছাউনি-হিল থেকে যে বাসখানা দার্জিলিঙে যায়, তিনিই তার স্বত্বাধিকারী। অশোক গিয়ে তাঁকে জানিয়েছিল, এভাবে খেয়াল-খুশি মতো গাড়ী চালালে সরকারী পোস্ট্ অফিসের কাজ চলবে না।

শুনে, লামা কড়া হুকুম জারী করেছেন বীর বাহাদুরকে। বলে দিয়েছেন, যে করেই হোক সাড়ে চারটের মধ্যে মেল্ নিয়ে পৌঁছুতে হবে ছাউনি-হিলে।

তাই আজ সকাল সকাল ডাক এসেছে।

কাল পরশু দুটো দিনই মেঘলা গেছে—সেই সঙ্গে চলেছে অল্প অল্প বৃষ্টি। যেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে কেঁদেছে ছাউনি-হিল। কিন্তু ভারী সুন্দর আজকের বিকেলটি। রোদের আলোয় বর্ষাধোয়া পাহাড় ঝিলমিল করছে।

যথানিয়মে প্রায় সবাই এসেছে ডাক নিতে। শুধু ডাক্তার অনুপস্থিত আজকে।

খবরের কাগজ খুলেই চ্যাটার্জী বললে, আবার ড্র করে বসেছে এরিয়ান্সের সঙ্গে। নাঃ—মোহনবাগানের আর কোনো চান্স্ই নেই। আমি আর ওদের সাপোর্ট করবো না।

সরোজ বললে, তবে কাকে সাপোর্ট করবে ?

—মোহামেডান স্পোর্টিং।

—মোহামেডান স্পোর্টিং !

—কিম্বা কাস্টমস্। নইলে ডালহৌসি। নয়তো কুমারটুলী। বি-জি প্রেস—বেনিয়াটোলা যেটাই হোক। এ-বি-সি-ডি—কোন ডিভিসনেই আপত্তি আমার নেই। মোদ্দা মোহনবাগান আর নয়—চ্যাটার্জীর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

—এটা বৈরাগ্যের প্রথম ধাপ চ্যাটার্জীদা!—সরোজের হাসি শোনা গেল।

শৈলেশ বললেন, সিনেমার কথা বলো হে চ্যাটার্জী—সিনেমার কথা বলো। জীবন নিয়ে যেখানে ফুটবল খেলা হয়, সেইখানেই তো আসল স্পোর্টস্ হে !

সরোজ বললে, যা বলেছ ! সে খেলায় স্কোয়ার হচ্ছে মেয়েরা।

শৈলেশ দে বললেন, ঠিক ধরেছিস, তোর ব্রেন আছে দেখছি। আর গোল-কীপার কে ?

—তাও কি বলতে হবে ? ওটা হতভাগা পুরুষদের জন্যেই বরাদ্দ। গোল সামলাতে সামলাতে প্রাণান্ত—তবু কোন্ ফাঁকে দুটো-একটা যে ঢুকে যায় ঠাহরই পাওয়া যায় না।

অশোক ডাক কাটছিল। একখানা পেট মোটা খাম ছুড়ে দিলে সরোজের দিকে।

—নে হতভাগা, তোর গোল সাম্‌লা। বৌয়ের চিঠি এসেছে।

শৈলেশ মিইয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ। মুখে কিছু বললেন না, কাতর দৃষ্টিতে ডাকের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইলেন। না—

আজো কিছু নেই তাঁর। অফিসের গোটা ছুই খাম এসেছে—তাতে কি আছে না খুলেই অনুমান করা চলে।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আমি যাই—আমার কাজ আছে।

—কী হল শৈলেশদা? এমন সাত সকালে ফেরার তাড়া কেন?

—একটা জরুরি হাতের কাজ ফেলে এসেছি—বলেই শৈলেশ বেরিয়ে গেলেন। সরোজের ওই পেট মোটা খামটা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। পর পর ছুখানা চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু একখানারও জবাব এল না স্ত্রীর কাছ থেকে। বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছেন শৈলেশ, অথচ বনে-জঙ্গলে চাকরী করেন তিনি—তাঁর চেহারা একটা ভালুকের মতো! এ উপেক্ষা তাঁর পাওনা।

ছুটি পাওয়া যাবে আজ হোক, কাল হোক। কিন্তু ছুটি নিয়েই বা লাভ কী? যে-স্ত্রীর মনে তিনি এতটুকুও জায়গা পাননি, তার কাছে গিয়ে মনের যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না শৈলেশের। তার চেয়ে এই ভালো তাঁর পক্ষে। এই ভালো, ছাউনি-হিলের নির্বাসন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে জড়িয়ে ধরুক একটা বিষধর সাপ—বসিয়ে দিক ছোবল; নইলে ভালুক এসে জাপটে ধরুক করাল আলিঙ্গনে। কিংবা যা হওয়ার একটা কিছু হয়ে যাক। এ-ভাবে আর বাঁচতে উৎসাহ হয় না শৈলেশের।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে জল এল।

চ্যাটার্জি এখানে নিজের স্ত্রী আর ছেলে পুলে নিয়ে থাকে—তার কোনো ছুশ্চিন্তাই নেই। এবার ক্ষুণ্ণ চিত্তে সে কুস্তি আর বক্‌সিংয়ের বিবরণ পড়তে লাগল।

ছুখানি চিঠি আছে বারো নম্বর বাংলোর—সর্ট করতে করতে অশোক দেখতে পেলো। একখানা সাহেব কোম্পানীর গম্ভীর চেহারার খাম—অনুপমের নামে—নিশ্চয় ওতে ওর হার্বাল্‌ রিসার্চ সম্পর্কে খবরাখবর আছে কোনো। এর মধ্যেই পাহাড় থেকে লতাপাতা নিয়ে কী সব কাজ আরম্ভ করেছে অনুপম। আর

একখানায় বুলুর নাম—মেয়েলি হাতের টান স্পষ্টই বোঝা গেল। ওর কোনো বান্ধবীর লেখা খুব সম্ভব।

বারান্দায় গিয়ে চিঠিটা পড়ে ফিরে এল সরোজ। মুখ উদ্ভাসিত।

কেমন একটা সংকোচে অশোক বারো নম্বরের চিঠি দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখল, তারপর নিজের কুণ্ঠা চাপা দেবার জন্যে সম্ভাষণ করলে সরোজকেই।

—কিরে, খুব যে খুসি দেখছি! ব্যাপার কী?

—ব্যাপার কিছু নয়—পুরো আট পাতা প্রেমপত্র পড়বার পরিতৃপ্তি মুখে এঁকে সরোজ বললে, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু তুমি কি বারো নম্বরের চিঠি নিয়ে ধ্যান করছ অশোকদা?

মাত্র সাত আটটা দিন কেটেছে অনুপমরা আসার পরে। আর এর ভেতরে অশোককে কয়েকবার বারো নম্বর বাংলোয় যেতে হয়েছে—বেড়াতে হয়েছে বুলাদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা থেকে এর মধ্যেই একটা অর্থ তৈরী হয়ে গেছে—এটা অশোক কল্পনাই করতে পারেনি।

অশোক চমকে উঠল, লাল হয়ে গেল মুখ: কী বলছিস স্টুপিড?

—আমি কিছুই বলছি না অশোকদা—একটা মিটি মিটি হাসি সরোজের মুখে: তবে অনুমান করছি।

—কিসের অনুমান?

—একটা ভালো ফীস্টের।—চ্যাটার্জি বেরিয়ে গেছে দেখে সরোজ বলে চলল: সত্যি বলছি অশোকদা—অনেকদিন একটা রোমান্স-টোমান্স ঘটছে না দেখে মনটা ভারী মিইয়ে গিয়েছিল। আশা হচ্ছে, তুমি একটা জমিয়ে তুলছ। তা তোমার রুচিটা মন্দ নয় অশোকদা—বুলা মেয়ে হিসেবে ভালোই। একটু বেশী বক্ বক্ করে এই যা—তা সে তো ওদের জাতীয় চরিত্র। যাই হোক—আমরা সমবেত প্রার্থনা করছি এই বলে যে—

সরোজের কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল আশোক—বুকের ভেতরে দপ দপ করছিল হৃৎপিণ্ড। আশ্চর্য, কত সহজে মানুষ সমাধান করে নেয়—ব্যাখ্যা করে বসে কত অবলীলাক্রমে! আর সঙ্গে সঙ্গেই রসিকতা তৈরী—মুখে আর কিছু আটকায় না। দুইয়ের সঙ্গে দুই মেলাবার কী অসাধারণ ক্ষমতা!

কিন্তু সরোজ যখন প্রার্থনা পর্যন্ত পৌঁছুল, তখন আর থাকতে পারা গেল না। সক্রোধে একটা খালি মেল-ব্যাগ্ বাগিয়ে তুলল মাথার ওপর।

—এই স্টুপিড্—চুপ কর্। ছিঃ—ছিঃ—বাইরের লোক—ক'দিনের জন্যে এখানে এসেছেন, আমরা ওঁদের নিয়ে এই রকম নোংরা ডিস্কাশন করি জানলে কী ভাববেন বল্ তো?

—নোংরা কিসে হল? রোমান্সই তো জীবনের আসল রস অশোকদা। যখন তার এমন একটা সুযোগ এসেই গেছে তখন তা ছেড়ে দেবেই বা কেন?

—তুই ভারী ভাল্গার হচ্ছিস সরোজ। তোকে একটা থাপ্পড় দেওয়া দরকার।

—কিন্তু তুমিও বড্ড পিউরিটান হয়ে যাচ্ছ অশোকদা। এ-সব রোগ আগে তোমার ছিল না।

অশোক হাসল: পিউরিটান নয়—অন্য জিনিশ।

—সে কি রকম?

—“Un lien saccage!”

—ও আবার কী?—সরোজ হাঁ করল।

—ফ্রেঞ্চ্। ওর মানে হল একটি বিধ্বস্ত ভূমি।

—কী বিধ্বস্ত ভূমি?

—আমার হৃদয়। ওখানে আর কোন রোমান্সের জায়গা নেই। সরোজ হেসে উঠল: তুমি এককালে কবিতা লিখতে অশোকদা—আজো রোগ তোমার কাটেনি। কবিরা নিজের হৃদয়কে মরুভূমি বলেই আরাম পায়। তারা বার বার ডেকে বলতে থাকে, ওগো

সুন্দরীরা, তোমরা কেউ এসো না আমার কাছে, আমি শূন্য—আমি শ্মশান! কিন্তু যেই একটি বেদুইন কন্যা সেই মরুভূমিতে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে ওঠেঃ এসো—এসো, তুমিই আমার মানসী—তোমারই জন্যেই এতকাল আকুল প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি।

অশোক বললে, চুপ কর ইডিয়ট, নিজের কাজে যা। দেখছি বাইরে থেকে কোনো ভদ্রলোকের তোদের এখানে আসাই উচিত নয়। একদম বুনো হয়ে গেছিস তোরা। ওসব বাজে কথা থাক। দাদুর খবর কিরে? দিন তিনেক যে দেখছি না!

সরোজ বললে, দাদুর মেয়ে এসেছে যে পরশু। খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে বোধ হয়। দাদু আবার যে-রকম ভোজন-বিলাসী—

—কে এসেছে—রুচিরা?

—হাঁ—হাঁ, সেই তালধ্বজ!

—ছিঃ—ছিঃ সরোজ।

—আমার স্পষ্ট কথা অশোকদা। দাদুর চেহারাটা তো বয়েসকালে ভালোই ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা এমন কদাকার হল কী করে? যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, তেমনি উঁচু উঁচু দাঁত। অত ফর্সা রঙ বলে আরো খারাপ দেখায়—নাম দিতে ইচ্ছে করেঃ মেম পেত্নী!

—থাম্ বর্বর। নিজের বৌ ছাড়া কাউকে বুঝি চোখে লাগে না?

সরোজ বললে, নিজে কবি হয়ে এ-কথা বললে অশোকদা! তুমি এটা বিলক্ষণ জানো, বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোনো মেয়েকে অপ্সরী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে—রুচিরা সেই সীমার বাইরে। নাম শুনলে যেমন লোভ হয়, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি দ্বিগুণ অরুচি জন্মে যায়।

কী জ্বালাতনে পড়লাম বল্ তো! পালা বলছি সরোজ—পালা এখান থেকে—অশোক মেল ব্যাগ তুলে সত্যিই তাড়া করল এবার।

সরোজ পালালো।

কিছুক্ষণ একা চুপ করে বসে রইল অশোক। বাস্তবিক, বুলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এম্‌নি স্তরেই কী পৌঁছেছে যে তা নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা শুরু করে দেওয়া যায়? ভাবতেই নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হল তার। প্রথমত বুলাকে নেহাত মন্দ লাগে না বলেই প্রবল বেগে ভালো লাগতে হবে, এতটা তুর্বল মন নয় অশোকের। দ্বিতীয় কথা হল, বুলার কাছে এর বেশি এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না কখনো—কারণ তু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের জীব। সব শেষ কথা হল—অকারণ পুলকে রোমান্স্‌ তৈরি করবার মতো উৎসাহ কোনোদিনই অশোকের নেই—এই বনে বাস করেও এখনো সে অতখানি বুনো হতে পারেনি। পুরুষে মেয়েতে একটুখানি সহজ সম্পর্ক দেখলেই এরা যে কী ভাবে তার একটা অর্থ খুঁজে বের করে—সেটা ভাবতেও খারাপ লাগে।

তবু—তবু—সব কথার ওপরেও আর একটা কী যেন কথা অশোকের মনের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। একরাশ ছায়া—একরাশ কুয়াশা। সরোজের কথায় তার রাগ হচ্ছে, কিন্তু খুব খারাপ তো লাগছে না। একটা মিষ্টি আমেজের মতোই আস্বাদন করতে ইচ্ছা হচ্ছে বারবার। নাঃ—এসব ভালো লক্ষণ নয়।

একবার ভেবেছিল, নিজের হাতেই আজ বারো নম্বর বাংলোর চিঠি তুটো দিয়ে আসবে—যেমন আরো কয়েকবারই দিয়ে এসেছে। কিন্তু কেমন ভয় পেয়ে গেল আজকে। বাইরে একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে—ঘরের ভিতরে নামছে অন্ধকার। কাঞ্ছা একটা লণ্ঠন জ্বেলে এনেছিল, সেটাকে কমিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে রইল অশোক।

ডাক নিতে পোস্ট অফিসের দিকেই আসছিল অনুপম। সারাটা দিন হিমালয়ের গাছপালা সম্পর্কে বই পড়ে কাটিয়েছে সে—বুলার তাড়াতে উঠে পড়তে হল।

অনুপম অবশ্য বলেছিল, আপনারা সবাই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করবেন—নতুন জায়গায় আমরা একেবারে একা—এক আধটু সঙ্গ দেবেন আমাদের—

কিন্তু সে নিছক বলবার জন্যেই বলা। নইলে একা থাকতেই ভালো লাগে অনুপমের—মনের দিক থেকে তার সঙ্গীর প্রতি বিশেষ কোনো প্রলোভন নেই। ছাউনি-হিলের মানুষগুলোও তা বুঝেছে। দেখা হলে হৃদ্যতা রাখে, কিন্তু গায়ে পড়ে উপদ্রব করে না কেউ। হঠাৎ গিয়ে পড়লে সে এমন বিব্রতভাবে মোটা মোটা বইগুলো বন্ধ করে ফেলে যে দস্তুরমতো মায়া হয়।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই বেরিয়েছিল অনুপম। বেশ একটা কৌতূহলজনক অধ্যায় সে পড়ছিল, সেখান থেকে এভাবে উঠে আসবার কিছুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না।

অন্যমনস্কভাবে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা লতা নয়? পাহাড়ের ঢালুতে একটা ঝর্ণার ওপরে ঝালরের মতো দুলছে সেটা। খুব ইন্টারেস্টিং চেহারা। ওই রকম কী একটা লতার সম্বন্ধেই কি এক্ষুণি সে পড়ছিল না?

অনুপম লতাটা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করল।

ঠিক হাতের কাছে নয় একটু নিচে নামতে হবে। ঝর্ণার পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে সন্তর্পণে নামবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু পাথরগুলো শ্যাওলা ধরা—পা পিছলে যেতে চাইছে বারবার!

—সর্বনাশ—করছেন কি!

অনুপম চমকে পা তুলে নিলে। নির্জন পথে যেন ভূতুড়ে গলা শুনল একটা।

—শুনছেন, নামবেন না ওখানে। পাথরগুলো ভিজে—তার ওপর আলগা হয়ে আছে। যদি একবার একটা সরে যায়, তা হলে দেড়শো ফুট নিচে খাদে গিয়ে পড়বেন।

ভূতুড়ে আওয়াজ নয়—মানুষেরই স্বর। একটি মেয়ের গলা।

অনুপম দেখতে পেলো এবার। পাশেই শ্যামলতা আর শানাই

ফুলে ছাওয়া ছোট একটা টিলা একটা টেবিলের মতো উঁচু হয়ে আছে। সেই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। অদ্ভুত রোগা, অদ্ভুত ফর্সা, অদ্ভুত লম্বা। তার সারা শরীর বিকেলের সোনালী আলোয় একটা আশ্চর্য রঙ ধরেছে—মনে হচ্ছে যেন সোনার পাত দিয়ে সে গড়া। পরণের লাল শাড়ীটা চুনীর মতো জ্বল জ্বল করছে তার। হাতে তূলি সামনে ইজেলের ওপর ক্যানভাস—মেয়েটি ছবি আঁকছিল।

যেন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না—এমনিভাবে অনুপম দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটি হেসে বললে, আপনি বারো নম্বর বাংলোয় থাকেন—তাই নয়।

অনুপম আশ্চর্য হয়ে বললে, আপনি—

—আমার বাবাকে আপনারা চেনেন। তাঁর নাম কৌশিক ঘোষ।

—তা হলে আপনি—

—রুচিরা। রুচি বলেই ডাকতে পারেন আমাকে।

রুচি এবার আঁকার সরঞ্জামগুলো একটা ঝুলিতে ভরে ফেলল। তারপর ছবিশুদ্ধ ইজেলটাকে তুলে নিয়ে বললে, কী খুঁজছিলেন ওখানে ?

অনুপম বললে, একটা লতা।

—লতা! কী করবেন ?

অনুপম লজ্জিত হয়ে বললে, একটু কাজ আছে।

রুচি তখন টিলা থেকে নেমে এসেছে। অত্যন্ত সহজভাবে বললে, তা হলে এগুলো একটু ধরুন—আমি এনে দিচ্ছি।

—আপনি পারবেন কেন ? এক্ষুণি তো বলছিলেন ভিজে পাথর, পা পিছলে যেতে পারে—

—এখানকার পাহাড়ের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের পরিচয়—উঁচু-উঁচু দাঁত বের করে রুচি হাসল: আমরা ওঠা-নামা করতে জানি। বলুন না—কী আপনার দরকার।

অনুপম আরো লজ্জিত হল: এখন থাক, পরে হলেও চলবে। এমন বিশেষ কিছু তাড়া নেই। কিন্তু—ইজেলের দিকে তাকিয়ে অনুপম বললে, বেশ তো ছবি আঁকেন আপনি। ওটা কী করছিলেন?

—একটা ল্যাণ্ড্স্কেপ্। আমি কলকাতায় আর্টস্কুলে পড়ছি কিনা।

দুজনে তখন চলতে আরম্ভ করেছে। অনুপম বললে, আর্টিস্ট্দের আমার ভারী হিংসে হয়।

—কেন বলুন তো?—শাদা কোটরের ভেতর থেকে রুচির ম্লান চোখ চকচক করে উঠলো।

—ড্রয়িংয়ের হাত ভারী খারাপ আমার। একটা বুন্সেনস্ বার্ণার পর্যন্ত ঠিক করে আঁকতে পারিনি কোনো দিন। ঠিক পান্তুয়ার মতো হয়ে যেত দেখতে।

রুচি হেসে উঠল।

মেয়েটার উঁচু উঁচু দাঁত—হাসিটা একটু কর্কশও বটে। তবু বিকেলের এই সোনালী আলোয়—সম্পূর্ণ নিজন এই পথে—শ্যাম লতা, শানাই ফুল আর গোটা কয়েক বড় বড় গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে—বেলা শেষেব পাখিব ডাকের সঙ্গে সুব মিলিয়ে সে-হাসি অনুপমের খারাপ লাগল না। মেয়েটির শরীরের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য আর পরনের লাল শাড়িটা কেমন আলাদা ব্যক্তিত্বের মতো মনে হল অনুপমের।

খানিক দূর এগিয়েই মেয়েটি থামল। বাঁ দিকে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ছোট একটা পায়ে-চলা পথ দেখিয়ে বললে, আসুন না।

—এই জঙ্গলের মধ্যে! কোথায়?—অনুপম চমকে উঠল।

—জঙ্গলে নয়—আমাদের বাড়ীতে।

—কিন্তু ওটা তো আপনাদের বাড়ীর রাস্তা নয়।

—শর্ট কাট। পাহাড়-বনে আমরা থাকি—অনেক রকম সোজা পথের খবর রাখতে হয় আমাদের। চলুন না একবার—বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অনুপম।

— আজ থাক।

রুচি বললে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এই জংলা পথে একা পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমাকে ? বেশতো !

—আমি না এলে তো আপনি একাই যেতেন।

—তা যেতাম। কিন্তু যখন আপনি এসেই পড়েছেন, তখন আর সুযোগ ছাড়ব কেন ? আসুন না।

—তবে চলুন।—অনুপমের স্বর বিপন্ন শোনালো।

—শুধু নিজের জন্যেই আসতে বলছি তা নয়।—রুচির দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল : দুদিন থেকে বাবার শরীরটা ভালো নেই—সর্দিজ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। বেরুতেও পারেন না—একা একা বসে থাকতেও ওঁর ভালো লাগছে না। আমাকে অবশ্য জোর করেই বাইরে পাঠালেন, বললেন, কেন ঘরে বসে থাকবি—একটু ঘুরে আয়। তবে আপনারা কেউ ওঁর কাছে গেলে সত্যিই ভারি খুশি হবেন।

—দাদুর জ্বর হয়েছে ? জানতাম না তো। পোস্ট অফিসের কথা ভুলে—অনুপম রুচির সঙ্গে বাঁ দিকের পায়ে-চলা পথটা ধরল : তবে চলুন, একবার দেখা করেই আসি।

রুচির রূপ নেই—রুচি সুন্দরী নয়। তাই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েও কোনো কুণ্ঠা আসে না—ট্রেনের সহযাত্রীর মতোই স্বচ্ছন্দে আলাপ করা চলে। সে পুরুষ না মেয়ে এ কথা পর্যন্ত মনে রাখবার দরকার হয় না।

পথের দুদিকেই ঘন পাইনের বন। এত নিবিড় যে সূর্যের আলো পর্যন্ত সহজে আসতে পায় না। নিচের মাটি থেকে গাছের গুঁড়িগুলো পর্যন্ত ভিজে স্যাঁৎসেঁতে—গাছের গায়ে সবুজ শ্যাওলার জট ঝুলছে, যেন কোন্ আদিম যুগের জটা বুড়ীর বন। অনুপমের গা ছম ছম করে উঠল।

রুচি বললে, এই জঙ্গলে ভালুক আসে।

অনুপম থমকে গেল ঃ বলেন কি !

—ভয় নেই, এখন নয়। তারা আসবে ভুট্টা পাকবার সময়।

—মানুষকে কিছু বলে না ?

—পারতপক্ষে নয়। জানেন—মানুষ ওদের যতটা ভয় পায়, মানুষকে ওরা ভয় পায় তার চাইতে ঢের বেশি।

অনুপম একটা নিঃশ্বাস ফেলল ঃ ভরসা হচ্ছে না।

রুচি বললে, আমিই একবার দেখেছি একটা। কালো রঙ—গলায় শাদা কলার—চেহারাটা বেশ। দেখে ভারী ভালো লাগল !

—ভালো লাগল !—অনুপম শিউরে উঠল ঃ তেড়ে এল না ?

—না। বেশ মন দিয়ে ভুট্টা খাচ্ছিল তখন। আমাকে আক্রমণ করার চাইতে খাওয়াটাই ওর বেশি ভালো লাগছিল নিশ্চয়।

অনুপম জবাব দিল না। শুধু ত্রস্ত দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলে আশেপাশে। কালো কালো গাছের গুঁড়ি—গায়ে সবুজ শ্যাওলার আভরণ। চারদিকে ঝাপসা অন্ধকার—মাথার ওপর নাগশিশুর মতো কতগুলো লতানো অর্কিড্ ঝুলছে। জটা বুড়ীর বনই বটে।

রুচির কথায় সে চকিত হয়ে উঠল।

রুচি বললে, ওই দেখুন বাংলো—এসে পড়েছি। কত সোজা রাস্তা—বলুন তো !

পোস্ট অফিসে যাবার আগে পুল-ওভারের ওপর কোট পরছিল ডাক্তার। এমন সময় বাংলোর বারান্দা থেকে ক্যাপ্টেনের ডাক শোনা গেল ঃ ডাক্তার, ডাক্তার !

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললে, ব্যাপার কী ? হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছ কেন ?

—কথা আছে ডাক্তার।—ক্যাপ্টেনের গলার আওয়াজ করুণ শোনাল।

ডাক্তার তাকিয়ে দেখল। ক্যাপ্টেনের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ

হবে। মুখে কতগুলো এলোমেলো কালো কালো রেখা, বয়েসের ছাপ নয়, অমিতাচারের চিহ্ন। এককালে শক্তিমান পুরুষ ছিল— এখন ঘুণ ধরেছে। অতিরিক্ত নেশা করে—চোখে ঘোলা লাল্‌চে রঙ—দাঁতগুলোয় হলুদ রঙের পাতলা আস্তর পড়ে গেছে। মোটা ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে না—খুব সম্ভব স্নায়ুর দুর্বলতার লক্ষণ।

যুদ্ধের উচ্ছিষ্ট ক্যাপ্টেন। একটা পোড়া তুবড়ীর খোলস। পেনসনের সামান্য কিছু টাকা পায়—সেটা যায় মদের পেছনেই। দার্জিলিং থেকে এক-আধটা সচিত্র বিলাতি পত্রিকা কিনে আনে—সব সময় বগলে থাকে সেগুলো। ক্যাপ্টেন ইংরেজী পড়তে পারেনা বললেই হয়, তবু ওর একটা সঙ্গে রাখা চাই। সে যে একদা ক্যাপ্টেন ছিল, সে যে এখানকার সাধারণ নেপালীদের চাইতে অনেকখানি বিশিষ্ট—ওই ইংরাজী পত্রিকাটাই যেন সে স্বাক্ষর বহন করে।

জীর্ণ আর্মি ওভার কোটের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন। টলছিল অল্প অল্প।

—আবার ড্রিঙ্ক করে এসেছ খানিকটা?—রাজনীতি করা পিউরিটান ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করল।

—জাস্ট এ সিপ ডক্—জাস্ট এ সিপ!—ক্যাপ্টেন যুদ্ধ ফেরত লোক, তাই ডক্টর বলে না, সামরিক পরিভাষায় বলে: ডক্।

—জাস্ট এ সিপ? এর পরে যখন লিভার ফেটে যাবে, টের পাবে তখন।

ক্যাপ্টেন মাতালের হাসি হেসে উঠল: তখন আর টের পাব কি ডক্—সব টের পাওয়ার বাইরে চলে যাব যে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই অ্যাম ওয়েটিং ফর। নাও—চলো এখন—

—কোথায় যেতে হবে?

—তোমার পেশেণ্ট আছে।

—পেশেণ্ট! কে?

—মাই সিস্টার! মানে আমার বোন।

—তোমার বোন? ডাক্তার আশ্চর্য হল: এত দিন তো জানতাম তোমার তিন চুলোয় কেউ নেই। এর মধ্যে আবার একটা বোন জোটালে কোত্থেকে?

—ইট ইজ এ স্যাড স্টোরি ডক্—ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল: সে অনেক কথা। পরে সব তোমায় বলব।

—আচ্ছা, চলো তা হলে। পোস্ট অফিসটা ঘুরে—

—না, না, পোস্ট অফিস নয়।—ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে উঠল: ভারী রেস্টলেস্ হয়ে পড়েছে। তুমি একবার গেলে হয়তো খানিক ভরসা পাবে!

—জ্বালালে!— বিরক্ত মুখে ডাক্তার বললে, কী হয়েছে তোমার বোনের?

—গেলেই বুঝতে পারবে। চলোই না—

ক্যাপ্টেনকে ঠেকাবার জো নেই—আরো বিশেষ করে যখন মাতাল হয়ে এসেছে। ঘরে চাবি দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। ভাবল পাঁচ মিনিটেই সেরে আসবে কাজটা।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ছ'জনে পাহাড়ী বস্তির দিকে নামতে লাগল। ছাউনি-হিলের আর এক রূপ এখানে। ঝক্‌ঝকে বাংলো নয়—ফুলগাছের বাহার নয়—লতানে গোলাপের ঝাড় গেটগুলোকে আলো ক'রে রাখেনি। বাংলোর কীপার, পথের কুলি, ছোট দোকানদার আর দশ রকম সাধারণ মানুষের উপনিবেশ। এরা ছাউনি-হিলের খিড়কির বাসিন্দা।

গায়ে গায়ে দারিদ্র্য-জীর্ণ বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তারই ভেতর ক্যাপ্টেনের আস্তানা। ক্যাপ্টেন নিজের মর্যাদার কথা ভেবে বাড়ীটাকে একটু বিশিষ্ট চেহারা দিতেই চেষ্টা করেছে। বাইরের বারান্দায় কাঠের রেলিং—তাতে সাদা রঙ। ঘরের দরজায় সস্তা ছিটের পর্দা, ছুখানা চেয়ার, একখানা টেবিল—এদিক-ওদিক স্বল্পাবৃতা মেম সাহেবদের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার।

বারান্দায় ডাক্তারকে বসিয়ে ক্যাপ্টেন ভেতরে গেল। একটু পরেই বললে, এসো।

দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাম্বিসের একখানা খাটের ওপর মোটা একটা ভুটিয়া কম্বল গায়ে চাপিয়ে, আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে আছে তার পেশেণ্ট। ডাক্তার যখন ঢুকল, তখন মুখে একটা কালো রুমাল চেপে ধরে সে কাশছিল।

চক্ষের পলকেই ডাক্তার বুঝতে পারল সব। ওই দৃষ্টি—অন্ধকার চোখে অম্নি উজ্জ্বলতা, ওই রকম মুখের চেহারা আর ওই কাশির আওয়াজ—এদের একটি মাত্র অর্থই আছে।

যক্ষ্মা!

ক্যাপ্টেন বললে, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এসো।

ক্যাপ্টেনের বোন রুমালে মুখটা মুছে বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল। হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, আসুন ডাক্তার বাবু। বসুন এই চেয়ারে।

পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। একটুও পাহাড়ী টান নেই।

দূরত্ব বাঁচিয়ে চেয়ার টেনে বসল ডাক্তার। সম্পূর্ণ অনাবশ্যক জেনেও প্রশ্ন করল: কী হয়েছে আপনার?

মেয়েটি হাসল: বুঝতেই তো পারছেন। দাদাকে বললাম, মিথ্যে আপনাকে বিরক্ত করে কোনো লাভ নেই, তবু ডেকে আনল —কথা শুনল না।

ক্যাপ্টেন বললে, আঃ, সাইলি!

সাইলি বললে, কেন চেপে রাখতে চাইছ ভাই? ডাক্তারের চোখকে কি আর ফাঁকি দিতে পারবে? কী বলেন ডাক্তারবাবু— আমাকে দেখেই কি বুঝতে পারেন নি আপনি?

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না, আশ্চর্য চোখ মেলে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। নেপালী মেয়ে—তবু কী করে চেহারায় যেন সমতলের ধাঁচ এসে পড়েছে। চোখা নাক—টানা টানা বড় বড়

চোখ—লম্বাটে মুখের গড়ন। বাঙালী না হোক—আসামী মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায় নিশ্চয়। সবচেয়ে বড় কথা—মেয়েটি এক সময়ে রূপসীও ছিল। আজকের ভাঙা কাঠামোর দিকে তাকিয়েও সে রূপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। গায়ের শাড়ীটা বাঙালী মেয়ের ধরণে পরা, মাথায় ফাঁপানো চুল—আর আশ্চর্য, এর মধ্যেও কপালে কুঙ্কুমের টিপ পরতে সে ভোলেনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বললে, অসুখের ব্যাপারটা ডাক্তারকে ভাবতে দেওয়াই ভালো, ও নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব রোগীর নয়। কতদিন ভুগছেন এ রকম ?

—প্রায় দেড় বছর। তবে আর বেশিদিন নেই বলেই গ্রামে ফিরে এসেছি।—সাইলি হাসল। সে-হাসিতে ক্ষোভ-দুঃখ কিছুই নেই—একটা নিশ্চিন্ত নির্বেদ ছড়ানো।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করল।

—এ-সব কথা বলবার সময় এখনো আসেনি। তা'ছাড়া আপনি যা ভাবছেন তা নাও হতে পারে। প্লুরিসিতেও এ-রকম হয়।

—প্লুরিসি!—সাইলির ঠোঁটে একবার কৌতুকের হাসি দেখা দিল। সান্ত্বনাটা এম্‌নি ছেলেমানুষি যে, বলে যেন নিজেই লজ্জা পেল ডাক্তার।

—তবে হাতটা দেখুন—যেন কৌতুকচ্ছলেই সাইলি হাত বাড়িয়ে দিলে। সেই মুহূর্তেই ডাক্তার অনুভব করল ভারী সুন্দর হাতখানা, মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও এখনো আশ্চর্য নিটোল। লাল কাচের চুড়ি রক্তের রেখার মতো দেখালো।

কিন্তু সবে তো ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে মেয়েটি। হঠাৎ ভারী বেদনা বোধ হল ডাক্তারের। এত তাড়াতাড়ি মরে যাবে —এত তাড়াতাড়ি ?

হাতটা একবার ছুঁয়েই ছেড়ে দিল ডাক্তার। দপ দপ করছে চঞ্চল নাড়ী। জ্বর একশোর কাছাকাছি।

ডাক্তার বললে, একবার হাসপাতালে চলো ক্যাপ্টেন—একটা ওষুধ লিখে দিই।

—ওষুধ?—দু'চোখে কৌতুক ছড়িয়ে সাইলি জানতে চাইল।

—ওষুধ বই কি। বিনা ওষুধে রোগ সারবে?—ক্যাপ্টেন চটে উঠল।

—আচ্ছা বেশ। আনো তা হলে ওষুধ—সাইলি এলিয়ে পড়ল বালিশে। যেন তার শিশুর মতো ভাইটির এটুকু ছেলে-মানুষিতে বাধা দিতে চায় না।

করুণার্দ্র গলায় ডাক্তার বললে, কিছু ভাববেন না, ভালো হয়ে যাবেন।

—বেশ।

ডাক্তারের কেমন অপরাধী লাগছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো ক্যাপ্টেন—আমার তাড়া আছে। আচ্ছা—নমস্কার।

—নমস্কার।—চোখ বুজেই সাইলি দু' হাত কপালে ঠেকালো।

পথে বেরিয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ নীরবে চড়াই ভাঙতে লাগল। তারপর জড়ানো গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, ডক্!

—বলো।

—বাঁচবে?

—ডোণ্ট্ বি ননসেন্স্ ক্যাপ্টেন। মরার প্রশ্ন এত তাড়াতাড়ি কেন?

—কী জানি!—ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার চুপচাপ। ডাক্তার কী যেন ভাবছিল। তাকে চকিত করে ক্যাপ্টেন বললে, ডু ইউ নো ডক্—মাই সিস্টার ওয়াজ এ ফিল্ম স্টার?

—ফিল্ম স্টার?—ডাক্তার চমকে উঠল: সে কি!

—তা হলে গোড়া থেকেই বলি। আমার বোন দার্জিলিঙে থেকে লেখাপড়া করত। তখন আমার দাদা বেঁচে—দার্জিলিঙে তার একটা কিউরিয়োর-দোকান ছিল—অবস্থা ভালোই ছিল

আমাদের। দাদা একটা অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেল—আমি গেলাম ওয়ারে, আমাদের অবস্থায়ও ভাঙন ধরল। যাক সে সব কথা। যা বলছিলাম, তাই বলি।

আমার বোনকে তুমি আজ দেখলে ডাক্তার—যখন ও মরতে চলেছে। কিন্তু ওর যখন পনোরো-ষোল বছর বয়েস, তখন যদি দেখতে! অমন সুন্দরী মেয়ে দার্জিলিঙে আর ছিল না। আর দুর্ভাগ্য দেখো, সেই সময় ও একজন বাঙ্গালী চেঞ্জারের প্রেমে পড়ল।

ডাক্তার উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

—বিয়েতে আমাদের আপত্তি ছিল। দাদা তো সে ছোকরাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিল যে দোকানের আশ-পাশে সে যদি আর ঘোরাঘুরি করে তাহলে সোজা কুক্‌রি দিয়ে তার গলা কেটে দেবে। কিন্তু ছোকরাকে ঠেকালে কী হবে ডক্—মাই সিস্‌টার ওয়াজ ম্যাড্ আফটার হিম। দু'জনে পালিয়ে গেল একদিন।

গেল কলকাতায়। কিন্তু ছোকরাটা একেবারে বাঁদর—মোর-ওভার, ম্যারেড্। আমার বোনকে নিয়ে সে বাড়ীঘর ছাড়ল। খেতে দেবে কি—নিজেরই খাওয়ার সংস্থান নেই। শেষ পর্যন্ত আমার বোন ফিল্মেই চান্স নিলে। একটা বাংলা বইতে নামলে, দু' তিনখানা নেপালী আর হিন্দি বইতেও অভিনয় করল। টাকা আসতে লাগলো মন্দ নয়। আর সেই টাকায়—ছাট প্যারাসাইট্ বসে বসে মদ গিলতে লাগল, ছুটতে লাগল রেসের মাঠে।

ডাক্তার ব্যথিত হয়ে বললে, তোমার বোন তাকে তাড়িয়ে দিলে না কেন?

—ওই তো মজা ডাক্তার—দ্যাট্ ইজ দি মিষ্ট্রি অফ্ এ উয়োম্যান্! অন্ধের মতো ভালবাসতো, এমন কি যখন মারধোর করতো, তখনো চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না। কী বলব ডক্—আমি যদি ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারতাম—

ক্যাপ্টেন দাঁতে দাঁত ঘষল একবার।

অস্বস্তিভরে ডাক্তার বললে, তারপর ?

—সোজা গল্প। শি গট্ টি-বি। অ্যাণ্ড হ্বাট্ রাস্কেল ? একদিন ওর টাকা-গয়না সব নিয়ে রাতারাতি উধাও হল। ও যে কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি হবে তারও উপায় রাখল না। সব চেয়ে অদ্ভুত কী জানো ডক্ ? এখনো মেয়েটা ওই স্কাউণ্ড্রেলকেই ভালোবাসে।

ডাক্তার জবাব দিল না—শুধু একবার তাকালো আকাশের দিকে। পাইন বনের ওপর সন্ধ্যার ছায়া নামছে—পাহাড়ের মাথায় থমকে থাকা মেঘের বিষণ্ণ অস্তরাগ।

ক্যাপ্টেন বললে, কখনো কখনো বাঙলীদের আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় ডক্—আই হেট দেম লাইক্ এনিথিং! আমার বোনের মতো মেয়েকে পেয়েও যে ভালোবাসতে পারল না, এত ভালো-বাসার বদলেও কশাইয়ের মতো গলায় যে ছুরি বসালো—হি ইজ্ এ ডগ! শুধু ওকে নয় ডক্—সমস্ত বাঙালীকেই আমার ইচ্ছে হয়—

ক্যাপ্টেন থেমে গেল। বললে, এক্সকিউজ মি ডক্। ইমোসন্যাল হয়ে পড়েছিলাম। আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই নি।

ডাক্তার ক্লিষ্ট গলায় বললে, আমি কিছু মনে করিনি ক্যাপ্টেন। আমার অবস্থা তোমার মতো হলে আমিও ওই কথাই ভাবতাম।

সামনে আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে। এককালের দেশ-প্রেমিক ডাক্তারের মন বেদনা আর করুণায় ভরে উঠতে লাগল। কত দুঃখ—কত চোখের জল—কত সাইলি!

কে কতটুকু করতে পারে কার জন্যে ?

টর্চের আলোটা মুখে পড়তে অশোক চমকে উঠল।

—কে ?

খিল্‌খিল্ করে হাসির আওয়াজ শোনা গেল: ভূত দেখলেন না কি ? আমি।

তাই। বুলাই বটে। মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো—গায়ে সেই ফিকে নীল ওভারকোট। হাতে ছোট একটা টর্চ নিয়ে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—ঘর অন্ধকার ক'রে এমন ঘাপটি মেরে বসেছিলেন কেন ?—বুলা জানতে চাইল।

—নিজের ঘরে বসে থাকব না তো যাব কোথায় ?—অশোক জবাব দিলে। তারপর বিব্রত হয়ে বললে, কিন্তু একেবারে ভেতরে চলে এলেন যে ? অফিস থেকে ডাক দিলেই তো পারতেন।

—আহা-হা—কী আমার অফিস! দেড়খানা ঘরের একখানায় অফিস—বাকী আধখানা পোস্ট মাস্টারের কোয়ার্টার। এরও আবার প্রাইভেসি আছে নাকি ?

অশোক বললে, তবু একেবারে ভেতরে চলে এলেন! বলুন তো কোথায় আপনাকে বসতে দিই এখানে। চলুন—চলুন—অফিসে চলুন।

—না এখানেই বসব আমি।—বুলার স্বরে জেদ ফুটে বেরুল।

বসব তো বটে, কিন্তু বাস্তবিক, জায়গা কই বসবার ? বুলা অতিশয়োক্তি করেনি। দেড়খানা ঘরই নিঃসন্দেহ। তবে অশোকের অংশ আধখানারও কম। তারও প্রায় সবটা জুড়ে আছে অশোকের তক্তপোষ—একটা বইয়ের শেল্‌ফ, চায়ের সরঞ্জাম, জামা-কাপড়ের আল্‌না, একটা ছোট টিপয়ের মতো টেবিল। অতিথিকে বরণ করবার মতো ঐশ্বর্য আছে মাত্র একটি—একখানা ইজি-চেয়ার।

ততক্ষণে ঘরের আলোটা বাড়িয়ে দিয়েছে অশোক। বুলা সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়ার উপক্রম করছে দেখে সে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

—বসবেন না, ওটায় বসবেন না।

—কেন, ওটার কী অপরাধ ?

—ওর ক্যান্‌ভাস খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ব্যালান্সের অনেক ক্যাল্‌কুলেশন করে বসতে হয়—নইলে যে-কোনো সময় সবশুদ্ধ নিয়ে নামতে পারে।

বুলা বললে, যাক। পোস্ট্ অফিস দেখলাম, পোস্ট্ মাস্টারের ঐশ্বর্যও দেখতে পাচ্ছি। অতিথিকে তাহলে বুঝি দাঁড়িয়েই থাকতে হবে ?

—কিছু মনে না করেন তো—অশোক বললে, আমি বরং চেয়ারটা ম্যানেজ করছি, আপনি এই খাটে এসে বসুন।

—কেন, ব্যালান্সের কৃতিত্ব দেখাতে চান বুঝি ? থাক—সে বাহাদুরীর দরকার নেই। দু'জনেই স্বচ্ছন্দে বসতে পারি খাটের ওপর।

বুলা তাই বসল। অশোক ভারী সংকুচিত হল মনে মনে। একটু আগেই শোনা সরোজর কথাগুলো গুঞ্জন করে গেল কানের কাছে। না—যে-কোনো মেয়েকে দেখলেই তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে হবে—ছাউনি-হিলের এই লোকগুলোর মতো এমন কুসংস্কার নেই অশোকের। তার মুশ্‌কিল এই, জিনিসটা এদের কারো চোখে পড়লে—

কিন্তু চুপ করে থাকবে বা চুপ করে থাকতে দেবে—বুলা সে জাতের মেয়েই নয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, রান্নাটা স্বপাকই চলে বুঝি ?

—ঠিক ধরেছেন !

—ওই কুকার আর স্টোভ বুঝি তার ব্যবস্থা ?

—অনুমান নির্ভুল আপনার।

—ভালো রাঁধতে পারেন ?

—খেতে যখন পারি, তখন ভালোই রাঁধি নিঃসন্দেহে।

—খেতে পারার আশ্চর্য শক্তি আপনাদের আছে—বুলা হাসল : সে দাদাকে দেখেই বুঝতে পারি। কিন্তু মিথ্যে এমন কষ্ট করে মরছেন কেন ? স্ত্রীকে নিয়ে এলেই তো পারেন।

—স্ত্রী নিরুদ্দেশ।

—মানে ?—বুলা ভয়ানক চমকে উঠল।

—মানে তিনি যে এখনো কোথায় আছেন, অথবা আদৌ জন্মেছেন কিনা—তাই এখনো জানতে পারিনি।—অশোক হাসল।

—তার মানে বিয়ে করেননি ?

—এবারেও আপনার অনুমান নির্ভুল মিস্ রায়চৌধুরী।

—কী মিস্ মিস্ করেন ?—বুলা বিরক্ত হলঃ শুনলেই মনে হয় যেন আমি টেলিফোন-অপারেটর কিংবা হাসপাতালের নার্স। হলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হইনি যখন, তখন স্বচ্ছন্দে বাঙালীমতে নাম ধরেই ডাকতে পারেন।

—আচ্ছা, তাই ডাকব।

বুলা বললে, হাঁ—তাই ডাকবেন। কিন্তু যা বলছিলাম। বিয়ে করেননি ?

—না।

—আপনি একটা অপদার্থ—বুলা সুনিশ্চিত মতামত জানালো।

—যা বলেছেন। অমন সোজা কাজটাও করে উঠতে পারলাম না সেইজন্যে।

বুলা তখন লণ্ঠনেব গায়ে একদল পোকার পবিক্রমা দেখছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, এবার তাহলে আর দেরী করবেন না—বিয়ে করে ফেলুন।

—তাতে আপনাব স্বার্থ কি ?

—নেমন্তন্ন খাবো।

—কিন্তু তখন আপনাকে পাবো কোথায় ? দু'দিন পরেই তো চলে যাবেন—ছাউনি-হিলের কথা আর মনেও থাকবে না।

বলেই অশোক কুণ্ঠিত বোধ করল। কেমন আবেগের রেশ এসে গেছে গলায়। কিছু ভেবে বসবে নাতো আবার ?

কিন্তু বুলা নিরাসক্ত।

—কাগজে পার্সোন্যাল কলমে বিজ্ঞাপন দেবেন—'বুলা দেবী, আমি বিয়ে করছি। নেমন্তন্ন খেতে চান তো অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।'—বলে হাসিতে বুলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অশোকও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটার জোর এল না। প্রসঙ্গটাকে বদলে নিতে চাইল।

—রাত হয়ে গেছে—একা একা এলেন যে ?

—তাতে কি ! দেখলাম, এখানে ভয় করার কিছু নেই, এখানকার মানুষই আমাদের দেখে ভয় পায়। যাক সে সব। দাদা কোথায় বলুন তো ?

—অনুপম বাবু ? তিনি তো আসেননি।

—আসেননি ? তবে গেল কোথায় ? বুলা এবার চিন্তিত হয়ে উঠল : চিঠি নিয়ে যায়নি ?

—না তো। আপনাদের দুটো চিঠি এসেছে, আমি আলাদা করে রেখেছি। ভেবেছিলাম, কাল সকালে কাঞ্চার হাতেই পাঠিয়ে দেব।—অশোক উঠল, অফিস-ঘর থেকে নিয়ে এল চিঠি দুটো।

চিঠির দিকে একবার তাকিয়েই বুলা সে-দুটোকে নিজের হাত-ব্যাগে পুরে নিলে। তারপর সন্দিগ্ধ-গলায় বললে, আমি সেই দেড় ঘণ্টা আগে দাদাকে পাঠিয়েছি—মুখ থেকে বই কেড়ে নিয়ে। ওর জন্যে কতগুলো নোট করতে হচ্ছিল আমাকে—তাই নিজে আর বেরুলাম না। বলে দিয়েছিলাম, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে। এখানে আসেনি—গেল কোথায় তা হলে ? রেয়ার হার্বস্ খুঁজতে খুঁজতে বন-জঙ্গলে ঢুকে পড়ল নাকি ?

অশোক বললে, সে কি ! তা কি সম্ভব ?

বুলা বললে, দাদাকে জানেন না—ওর পক্ষে সবই সম্ভব। —বলেই উঠে দাঁড়াল : আমি চললাম।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

—দাদাকে খুঁজি। দেখি কোন্ দিকে গেল।

—এই রাতে কোথায় খুঁজবেন ? হয়ত গল্প করতে বসেছেন কোথাও। যথাসময়ে বাড়ী ফিরে যাবেন—ভাববেন না আপনি।

—দাদা বসবে গল্প করতে ? এই দশদিনেও ওকে চেনেন নি ? —বুলা উঠে পড়ল : ভারী ভয় করছে আমার। যাই খুঁজে দেখি—

অশোক ব্যস্ত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, অফিস-ঘর থেকে

কাঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল। চিঠি গোছাতে গোছাতে এতক্ষণ কান পেতে শুনছিল আলোচনা।

কাঙ্গা বললে, আমি দেখেছি। 'মাথি'তে গেছেন।

মাথি ? সে আবার কোথায় ?—বুলা আঁতকে উঠল।

অশোক হাসল: 'মাথি' অর্থে ওপরে, কৌশিক ঘোষের বাড়ীতে। অর্থাৎ নির্ভুলভাবে অনুপমবাবু দাদুর ওখানে গিয়ে গল্প জমিয়েছেন।

কাঙ্গা আবার সাড়া দিলে: জু! ঘোষ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে গেছেন।

অশোক হেসে উঠলো: শুনলেন তো? ঘোষ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে গেছেন অনুপমবাবু। আপনি আপনার দাদাকে যতটা আন্‌-প্রাক্‌টিক্যাল ভেবেছিলেন তিনি তা নন্‌।

—ঘোষ সাহেবের মেয়ে! কে সে?—বুলার ভ্রূ সংকীর্ণ হয়ে এল।

—রুচি। কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়ে। পরশু এসেছে এখানে।

ও।—কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বুলা বললে, একটা উপকার করবেন অশোকবাবু? আমাকে একবার নিয়ে যাবেন ঘোষ সাহেবের বাংলোয় ?

বুলার মুখের চেহারা দেখে অশোক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা সহজ লঘু সুর বাজছিল এতক্ষণ—কী করে যেন কেটে গেল সেটা। কোথা থেকে যেন মেঘ ঘনিয়ে এল এক টুকরো।

অশোক বললে, স্বচ্ছন্দে। চলুন।

সেই লাল কম্বলটা পায়ের ওপর টেনে দিয়ে সোফায় বসেছিলেন কৌশিক ঘোষ। ঘরের কোণে শেডের ঢাকনা দেওয়া ল্যাম্পটা তেমনি আলো ছড়াচ্ছে, বুক-সেল্‌ফগুলোর কোণায় কোণায় তেমনি ছায়ার স্তব্ধতা।

অনুপম বিব্রত হচ্ছিল। বারবার ভাবছিল, তার ওঠা উচিত। কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারছে না। যেন নিজের সঙ্গেই কৌশিক কথা কয়ে চলেছেন।

—বিজ্ঞানের কথা বলছ? তার ওপরেই বা ভরসা কোথায়? আজ পর্যন্ত কোনো জিনিসেরই কি স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পেরেছে! সব কিছুকেই তো মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে সে।

—আজ্ঞে সে তো ঠিকই।—অনেকক্ষণ পরে যেন বলবার মতো কথা খুঁজে পেলো অনুপম: বিজ্ঞান মাত্রেই অসমাপ্ত। তবে—

—তবে নেই। এটা নিশ্চয় যে বিজ্ঞান কোনো দিনই কোনো কথার জবাব দিতে পারবে না।—কৌশিক পাইপে একটা টান দিলেন: সে যতই খুঁজবে ততই দিশেহারা হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা বিরাট ধাঁধার ভেতরে নিজেকে নিয়েই কানামাছি খেলবে, অথচ সত্যের সোজা রাস্তা কোনোদিনই দেখতে পাবে না। সে রাস্তায় যেতে হলে যুক্তি চলবে না, ল্যাবরেটরী চলবে না, মাইক্রোস্‌কোপ চলবে না। মনের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে খুঁজতে হবে তাকে—বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পেতে হবে। এ-সব কি তোমরা মানো অনুপম?

অনুপম ক্লান্তভাবে হাসল। মানা-না-মানার প্রশ্ন তার কাছে এ-সব নয়। এ ধরণের কথা একবার দু'বার নয়, এত হাজার বার সে শুনেছে যে তার প্রতিবাদ করতেও আর ইচ্ছে হয় না অনুপমের। পক্ষীরাজ ঘোড়া বলে কিছু নেই—ঘোড়ার কখনো ডিম হয় না, কিংবা সাপের মাথায় মণি কোনো কারণেই সম্ভব নয়—এ-কথাগুলো যেমন বাচ্চাদের বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই, তেমনি বিজ্ঞানও যে কোনোদিন হাল ছেড়ে দিয়ে ভগবানের অধ্যাত্ম লীলায় আত্মসমর্পণ করবে না—এ-কথা বুড়ো মানুষকে বলবার অর্থ নেই কিছু। অনর্থক ওঁদের মনোবেদনাই বাড়ানো হয় ওতে। এ-সব ক্ষেত্রে মাথা নাড়াটাই একমাত্র ভদ্র এবং করণীয় পদ্ধতি।

দ্বিতীয়বার চা নিয়ে রুচিরা ঘরে ঢুকল।

—বাবা কি অনুপম বাবুকে যোগশাস্ত্র বোঝাচ্ছ এখনো ?

—যোগশাস্ত্র বই কি। যোগ হল আত্মস্থ হওয়ার উপায়—তারপরেই আসে ভগবৎ-উপলব্ধি। আগে অজ্ঞান দূর করা চাই, তারপরে বিজ্ঞান আসবে। বিজ্ঞান মানে অবশ্য সায়েন্স্ নয়—বিশেষ জ্ঞান। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরী থেকে সে অনেক দূরে।

—বাবা, এবার তোমার অনুপমবাবুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত! আমি পাঁচ মিনিটের কড়ার করে ওঁকে এনেছিলাম। তোমার এ-সব আলোচনা হয়তো ওঁর ভালো লাগছে না—হয়তো বিরক্তি বোধ করছেন—

—বিরক্তি! বিলক্ষণ!—অনুপম চকিত হয়ে উঠল: না—না, বেশ ভালো লাগছে আমার।

—ভালো তো লাগবেই।—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কৌশিক বললেন, মনকে বশ মানানোই সব চেয়ে কঠিন কাজ। তাই যোগ চাই—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ!' এই ছাখো না—ভালো কথা আমরা বলতে পারি অনেক, ভালো হতেও চাই—কিন্তু পারি কি? কোথা থেকে পাপ আসে, আসে লোভ—কিছুতেই আর নিজের মনকে বশে আনা যায় না!

বলতে বলতে বদলে গেল কৌশিকের গলার স্বর। এতক্ষণ তত্ত্ব-আলোচনা করছিলেন, হঠাৎ যেন সেখানে এল ব্যক্তিগত বেদনার আভাস। এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল: চৌরঙ্গির সেই সিনেমা—সেই কুৎসিত অপমানে কলঙ্কিত তীক্ষ্ণ সন্ধ্যা—খানিকটা তীক্ষ্ণ নির্মমতম হাসির আওয়াজ—

তারপর এই ছাউনি হিলে—

প্লেট্ থেকে খানিক চা চলকে গায়ে পড়ল তাঁর। কৌশিক চমকে উঠলেন।

আর তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে বেবি-ডেভির মিলিত অভ্যর্থনা শোনা গেল।

—কে এল ?

উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই ঃ দাছু, আমরা।

ঘরে ঢুকল অশোক আর বুলা।

—এই যে বুলা, এসো—এসো—কৌশিক উঠে বসতে চেষ্টা করলেন ঃ তবু ভাগ্যি এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়ল তোমার। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার মেয়ে রুচি।

—নমস্কার।—শুকনো গলায় বুলা বললে, পরিচয় হয়ে সুখী হলাম।

রুচি বড় বড় দাঁত বের করে হাসল ঃ আপনার কথা বাবার কাছে শুনেছি। আজ আপনার দাদার সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, কাল আপনাদের ওখানে যাব একবার।

—বেশ তো, যাবেন।—তেমনি শুকনো ভঙ্গিতেই বুলা জবাব দিলো।

কৌশকি বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন দিদি—বোসো।

অশোক বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুলার আশ্চর্য কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। অশোক উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বুলা বললে, দাদা, এই তোমার রেস্‌পন্‌সিবিলিটি? এই তোমার পোস্ট অফিসে আসা?

অনুপম কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। ত্রস্ত হয়ে বললে, না ভাবছিলাম, এখনি ফিরে যাব।

—ছু'ঘণ্টা ধরেই ভাবছিলে?

গলাটা এত উগ্র যে, ঘরের সবাই বিহ্বল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরে রুচিই সহজ করতে চাইল অবস্থাটা।

—ওঁর দোষ নেই কিছু। আমরাই ওকে আটকে রেখেছিলাম।

বুলা বললে, না, ওরই দোষ। ওর মনে রাখা উচিত ছিল, বাড়ীতে আমাকে একা ফেলে রেখে এসেছে। এবং বাড়ীর আধ মাইলের মধ্যেও দ্বিতীয় লোক নেই কোনো। —তীব্র দৃষ্টিতে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বুলা বললে, দাদা, তোমার আলোচনা কি শেষ হয়েছে? না আরো ঘণ্টা ছুই বসবে?

অনুপম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—না—না, আমি এখুনি যাচ্ছি।

—অশোকবাবু?—আর একটা তীক্ষ্ণ আহ্বান এল বুলার।

রুচির শাদা মুখখানা আরো শাদা হয়ে গেছে—অল্প অল্প কাঁপছে কৌশিকের ঠোঁট। একটা কিছু যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

অশোক একবার তাঁদের দি.ক তাকালো, আর একবার তাকিয়ে দেখল অদ্ভুত বিরক্তিতে বিকৃত বুলার মুখের দিকে। একটু আগেই ভালো লাগছিল, কিন্তু এখন অস্বাভাবিক কদর্য মনে হল বুলাকে।

অশোক বললে, আমি বরং একটু বসি।

—তবে তাই বসুন।—বুলার গলা ঝন্ ঝন্ করে উঠল: চলো দাদা।

ভাই-বোন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে ডেভি-বেবির আর্তনাদ উঠল আর একবার। রুচি টেবিলের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যে চায়ের পেয়ালায় একটা মাত্র চুমুক দিয়েছিল অনুপম, তার দৃষ্টি সেদিকেই। কৌশিক তাকিয়ে রইলেন শেল্‌ফের কোণায় কোণায় পুঞ্জিত ছায়ার দিকে—যেন তার মধ্যেই তিনি নিমগ্ন হয়ে গেছেন। আর অশোক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভাবতে লাগল, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতখানি নাটকীয়তা সৃষ্টি করার কী দরকার ছিল বুলার!

শেষ পর্যন্ত কৌশিক বললেন, অশোক:

—বলুন।

—আমাদের কোনো চিঠি আসেনি?

—না!

এ শুধু একটা কিছু আরম্ভ করে অস্বস্তির ঘোরটা কাটানো। কিন্তু তার পরে? তার পরে কি বলা চলে—কোন্ কথা দিয়ে জের টানা চলে এর?

অগত্যা জোর করে হেসে অশোক বললে, রুচি দেবী—কি নতুন ছবি আঁকলেন এবার দেখি!

ছয়

দার্জিলিং যাওয়ার বাসটা একটু সকাল সকালই ছাড়ে। তাই ব্যস্ত হয়ে আসছিল ডাক্তার।

আসতে আসতে ডান দিকে একটা ছোট টিলার ওপর নজর পড়ল ডাক্তারের। একটি দীর্ঘদেহিনী মেয়ে সেখানে স্থির হয়ে একটা মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপর যেদিকে সূর্য ওঠে, তার নজর সেদিকেই। যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে নিজের মধ্যে।

ডাক্তার চিনল। কৌশিক ঘোষের মেয়ে রুচিরা।

একটু পরেই একরাশ কুয়াসা এসে রুচির শুভ্র দেহটাকে আরো গভীর শুভ্রতার মধ্যে মুছে দিলে। ডাক্তারও আর দাঁড়ালো না, এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে।

সাইলি! এই তিন চার দিন ধরে মেয়েটা যেন মাথার মধ্যে একটা পাথরের মতো জমাট হয়ে রয়েছে। ফিল্‌ম স্টার। নানা ছবিতে নেমেছে—কত সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের সঙ্গে অসঙ্কোচে করেছে প্রেমের অভিনয়। ওপথে যারা যায় তাদের কারো সম্পর্কেই কোনো শ্রদ্ধা নেই ডাক্তারের—তারা কী রকম জীবন-যাপন করে সে সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ বর্ণনাই শুনেছে ডাক্তার।

তবু—

তবু পিউরিটান্ ব্যাচেলার ডাক্তারের মনের মধ্যে দোলা লেগেছে। এককালে সুন্দর ছিল মেয়েটি—আশ্চর্য সুন্দর। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথার কাছে। এত তাড়াতাড়ি? সবে তো ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে সে—বাঁচতে পারে, আরো অনেক দিনই তার বাঁচা উচিত। এখনি ফুরিয়ে যাবে সে? সেই নিটোল সুন্দর হাতখানাকে কিছুতেই তো ভোলা যাচ্ছে না।

আরো একটা কথা। ডাক্তার এককালে দেশসেবা করত। জাতিকে নিয়ে সে গর্ব করতে ভালোবাসে,—'বঙ্গ আমার জননী আমার' আওড়াতে তার মন ভরে ওঠে কখনো কখনো। ক্যাপ্টেনের সেই কথাগুলো এখনো তার কানের ভেতর বেজে চলেছে ঃ আমার বাঙালীদের ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় 'ডক্—আই লাইক টু হেট দেম—'

এতবড় অভিযোগ সহ্য করা যায় না। এর একটা প্রায়শ্চিত্ত ডাক্তার অন্তত করবেই।

কোনো টি-বি হাসপাতালে পাঠানোর প্রশ্ন আর ওঠে না। টাকার ব্যাপার তো আছেই, তা ছাড়া এমন একটা হোপলেস্ কেস্ নিয়ে কে বেড আটকে রাখতে রাজী হবে? দেশজোড়া অসংখ্য অসহায় যক্ষ্মারোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে এমন অন্যায় কথা ভাবতেও পারে না ডাক্তার। যে মরবার সে তো মরবেই—আর একজন সময়ে চিকিৎসা হলে যদি বা বাঁচতে পারত, তার পথ সে রোধ করবে কেন!

তার নিজের হাতে সব এইবার। বাঁচাতে পারবে না—টি-বি স্পেশ্যালিস্ট সে নয়—ওসব দামী দামী ওষুধ কেনবার সামর্থই বা কার আছে? ক্যাপ্টেনের পকেট তো গড়ের মাঠ—যা সামান্য কিছু পায় সেটা মদেই খরচ হয়ে যায়। শুধু নার্সিংয়ের ওপরেই যা কিছু করা যাবে এখন। আর অল্প-সল্প দু'একটা সাধারণ ওষুধ খাইয়ে—মনকে সান্ত্বনা দেওয়া চলে অন্তত।

কাল ডাক্তার বলেছিল, আমি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলব মিস্ সাইলি।

সাইলি সেই নির্বেদ হাসি হেসেছিল, কোনো জবাব দেয়নি।

ডাক্তার বলেছিল, শুধু ওষুধে নয়—মনের জোরেও অনেক সময় অসাধ্য রোগ সেরে যায় মানুষের। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলেও সে বেঁচে উঠতে পারে।

—কিন্তু বেঁচে কী লাভ?—একটা শান্ত জিজ্ঞাসা সাইলির।

—আবার সব নতুন করে শুরু করা চলে—ডাক্তার বলে

ফেলেছিল : বিশেষ করে আপনার। ইয়োর লাইফ্ ইজ টু ইয়ং ইয়েট্।

সাইলি শুধু নিজের নিটোল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল ডাক্তারের দিকে : দেখুন তো ডাক্তার—আজ আমার পাল্‌স্ কী বলে।

ইঙ্গিতটা বুঝেছিল ডাক্তার। তবু কিছুতেই যেন হার মানতে চায়নি। হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছিল, যতক্ষণ দরকার—তার চাইতেও বেশি। তারপর বলেছিল, কালকের চাইতে ভালোই চলছে আজ—আরো ভালো চলবে ভবিষ্যতে।

সাইলি চোখ বুজে পড়েছিল। আর জবাব দেয়নি।

সামনে সমুদ্র দেখেও তার ক্ষ্যাপা ঢেউকে রুখবার যেন চ্যালেঞ্জ নিয়েছে ডাক্তার। চেষ্টা সে করবে। লাভ নেই, তবুও করবে।

বাসটা প্রায় ছাড়বার মুখে ডাক্তার এসে পৌঁছুল। বীরবাহাদুরকে টাকা আর ওষুধের ফর্দ দিয়ে একটা বড় ডাক্তারী ফার্মের নাম বাতলে দিলে। তারপর ফিরে আসবে, এমন সময় অশোক ডাক্তারের পথ আটকালো।

—কী ডাক্তার, আজকাল বিকেলে যে এদিকে আর মাড়ান না! খবরের কাগজের নেশা হঠাৎ কেটে গেল নাকি? কাঞ্ছাকে দিয়ে কাগজ পাঠাতে হয়—ব্যাপার কী?

ডাক্তারের মুখ হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠল। অশোকের দিকে সে তাকালো না—দৃষ্টিটা মেলে রাখল পাহাড়ী পথের বাঁকের আড়ালে—যেখানে বাসটা এক ঝলক ধুলো উড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

ডাক্তার বললে, একটা পেশেন্ট নিয়ে বড্ড ব্যস্ত আছি। রোজ বিকেলে যেতে হয়—দেরীও হয় ফিরতে। তাই আর আসবার সময় পাই না।

অশোক বললে, আপনারা সবাই যে আমাকে ত্যাগ করলেন! শৈলেশদা বৌদির চিঠির অপেক্ষায় প্রায় ধরাশয্যা নিয়েছে—বাড়ীতে বসে খালি মুরগী গোণে। চ্যাটার্জি আর সরোজ চেন

কাঁধে নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। দাদুর অসুখ—আজ প্রায় সাতদিন তাঁর পাত্তা নেই। এদিকে আপনিও টাকা কামিয়ে বেড়াচ্ছেন দাদা—আমি বাঁচি কী নিয়ে?

ডাক্তার আরো সংকুচিত হল: টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। আমাদের ক্যাপ্টেনের বোন।

—ক্যাপ্টেনের বোন? র‍্যাদার ইন্টারেস্টিং! ওর আবার কোনো জন্মে ভাইবোন ছিল নাকি? আমরা তো ভাবতাম ও স্বয়ম্ভূ!

ডাক্তার বললে, সে অনেক কথা, আরেকদিন বলব। এখন চলি ভাই— অনেক কাজ আছে।

ডাক্তার যেন পালিয়ে বাচল। একটু পরেই ছাই রঙের কোট আর উদ্ধত শাদা কলার মিলিয়ে গেল কুয়াশার আড়ালে।

অশোক কেমন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কোথায় যেন কী হয়েছে—ছাউনি-হিলে আর সুর মিলছে না। নিজের মনের মধ্যেও একটা ঝাপ্‌সা অস্থিরতা ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কারণ পরশু সন্ধ্যায় কৌশিক ঘোষের বাড়ীতে—

কেন অমন ব্যবহার করল বুলা? কী বলতে চায়? রুচি পথ থেকে অনুপমকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে কী দরকার ছিল অতখানি অভদ্রতা করবার?

—নমস্কার অশোকবাবু।

অশোক যেন পেছন থেকে ঘা খেল একটা। তাকিয়ে দেখল, বুলাই বটে।

ওভারকোট নয়—একটা উলের নীল ব্লাউজ তার গায়ে, পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ী। সকালের সূর্যহীন বিষণ্ণতা সারা শরীরে জড়িয়ে এনেছে বুলা।

—নমস্কার।—আশোক জবাব দিল। কিন্তু খুব প্রসন্ন হয়ে নয়

—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।

অশোকের উৎসাহ ছিল না, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারল না। হাঁটতে লাগল বুলার সঙ্গে।

নিজের ভেতর অস্বস্তির পীড়ন বেশিক্ষণ বইতে হল না তাকে। বুলাই শুরু করল।

—সেদিন খুব চটে গেছলেন আমার ওপর ?

—না-না—চটব কেন ?—অশোক বিব্রত হয়ে জবাব দিলে।

পথের পাশ থেকে একটা সানাই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বুলা বললে, কিন্তু চটা উচিত। কেন ওরকম আমায় করতে হল তা জানেন ?

অশোক জবাব দিল না। শুধু চোখ তুলে তাকালো একবার।

বুলা বললে, আপনি দাদাকে চেনেন না। যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো সময় ওকে ট্র্যাপ্ করতে পারে। এমন দুর্বল মানুষ সংসারে আর নেই !

হঠাৎ অশোকের অত্যন্ত হাসি পেলো। রুচি ট্রাপ্ করবে অনুপমকে ! যে-রুচির দিকে তাকালে নারীজাতি সম্বন্ধেই অরুচি ধরে যায়, সরোজের দেওয়া 'তালধ্বজ' নামটাই যার একমাত্র উপযুক্ত বিশেষণ, অনুপমের মন সে ভোলাবে শেষ পর্যন্ত !

আর তা ছাড়া দু' বছর হল অশোক বদলী হয়ে এসেছে এখানে। এর মধ্যে বহুবারই তার রুচির সঙ্গে দেখা হয়েছে—আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে যথেষ্টই। তাতে করে অশোক অন্তত এই-টুকু বুঝেছে যে নিজের সম্পর্কে রুচি সম্পূর্ণ সচেতন। সে যে কুৎসিত, অসহ্য কদাকার—একথা তার নিজেরও অজানা নেই। আকার হাত রুচির ভালো। দেহে কোথাও সৌন্দর্যের চিহ্ন নেই, তাই মনের সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে রুচি ছবি আঁকে। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলা চলেঃ আপনার ড্রয়িংয়ের হাতটিতো ভারী সুন্দর—ভারী চমৎকার আপনার কালার সেন্স ! কিন্তু এ-কথা কোনো দিন, কোনোমতেই বলা চলে নাঃ আজ এই শাড়ীটায় কি সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে, বড় ভালো লাগছে

দেখতে। এমন কি, কেউ যদি কোনোদিন তাকে বলে: তোমাকে আমি ভালোবাসি, তা হলে অন্তত রুচি তা কিছুতেই বিশ্বাস্ করবে না!

অশোক বললে, কিন্তু রুচিকে দেখে কি ঠিক—

—বললাম তো, দাদাকে আপনারা চিনবেন না। অদ্ভুত মানুষ। কী যে দুর্বল—কী যে হেল্‌পলেস্! যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো সময় ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে উঠতে পারে?

ঠিক এই কথাটা বুলার মুখে এর আগেও কয়েকবার শুনেছে অশোক। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, অনুপমকে নিরীহ জানলেও অত-খানি গো-বেচারী সে কোনো মতেই ভাবতে পারে না। খালি মনে হয়, যেন নিজের মনের মতো করে বুলা সৃষ্টি করছে অনুপমকে —সে যা নয়, সেই ব্যক্তিত্বটাই আরোপ করছে তার ওপরে। অশোকের কেমন অদ্ভুত লাগে বুলাকে। সব সময় যেন একটা কল্পিত শত্রু সে দেখতে পাচ্ছে কোথাও, আর তাকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে রয়েছে আকাশে।

কেমন যেন মোহভঙ্গ হয়েছে অশোকের। ছাউনি-হিলের নিঃসঙ্গ প্রবাসে হঠাৎ আসা একটি তরুণী তার মনকে যেটুকু দোল দিয়েছিল, সেটা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে এখন। আজ আর বুলার মধ্যে সে বিস্মিত হওয়ার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না—কোথাও আবিষ্কার করতে পারছে না কোনো অপরিচিত বিচিত্রকে। পৃথিবীতে আরো অনেক মেয়ের মতো বুলাও একটি মেয়ে। একদা বুদ্ধিদীপ্ত কবি অশোক যেমন সহজ মুগ্ধতার জাল থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে-ছিল, আজো যেন তেম্‌নিভাবে বুলা সম্বন্ধে আত্মস্থ হচ্ছে আবার।

সরোজই ঠিক বলেছিল, মেয়েটা বড্ড বেশি কথা বলে।

অশোক বললে, ক্ষমা করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। অনুপম বাবুর এতদিনে বিয়ের বয়েস হয়েছে নিশ্চয়ই?

—কী আশ্চর্য, তা হবে না কেন?—বুলা বললে, কিন্তু আমার কথাটা কী—জানেন? আমার দাদা সায়েন্টিস্ট্—একেবারে সত্যি-

কারের বৈজ্ঞানিক। আমরা আশা করব তার উপযুক্ত সঙ্গিনী এমন একজন হবে—যাকে বলা যেতে পারে মাদাম কুরী। কোনো সাধারণ একটা মেয়ে এসে দাদার গুড্‌নেসের সুযোগে কাজ গুছিয়ে নেবে—এ আমি কখনোই সইব না!

—কিন্তু অসাধারণকে খুঁজতে খুঁজতে—অশোক বললে, মাপ করবেন, শেষ পর্যন্ত সারা জীবন ওঁকে একেবারে উপোস করে কাটাতে না হয়।

হঠাৎ বুলার চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল।

—দরকার হলে তাই কাটাতে হবে!

—বলেন কি?—অশোক কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, তাই।

—কিন্তু তাতে কী লাভ হবে শেষ পর্যন্ত?

—লাভ-ক্ষতি বলতে পারব না।—বুলার চোখ একটা অপরিচিত হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলতে লাগল: আমি চাই আমার দাদা সব চেয়ে বড় হয়ে উঠবে—এ ম্যান ইন্ এ মিলিয়ন। একটা অযোগ্য-সঙ্গিনী শেকল হয়ে তার পায়ে জড়িয়ে থাকবে, তাকে এতটুকু এগোতে দেবে না—এ কখনোই হতে পারে না!

বুলার ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর চোখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বুঝতে চেষ্টা করল অশোক। ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সমস্ত মনটা তার সংশয়ের ভারে জর্জরিত হয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে অশোক বললে, অপরাধ নেবেন না, আপনাকেও তো একদিন চলে যেতে হতে পারে?

—কেন?—বুলার স্বর উগ্র।

অশোক থমমত খেয়ে বললে, অর্থাৎ আপনিই যে খুব বেশি-দিন দাদার কাছে থাকবেন তার কী মানে আছে? আপনাকেও নিশ্চয় একদিন—

—না। দাদাকে যতদিন কোনো সত্যিকারের স্ত্রী জুটিয়ে দিতে না পারি, ততদিন নিজের কথা ভাবতে আমি রাজী নই

—সেই স্ত্রীটির জন্যে যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয় ?—বলেই ত্রস্ত হয়ে উঠল অশোক। সন্দেহ হল, এখনি হয়তো বুলা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু বুলা রাগ করল না। আস্তে আস্তে বললে, দরকার হলে তা-ই করব।

বিস্মিত ভাবনায় অশোকের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শুধু এই পাহাড়েই নয়; জীবনের প্রান্তে প্রান্তে—মনের কোণায় কোণায় এমন কুয়াশা জমে আছে, যেখানে এখনো সূর্যের আলো পড়ে না; এমন জটিল দুর্গম অরণ্য আছে যা চিরকাল ম্লান অন্ধকারেই তলিয়ে রইল।

—কী ভাবছিলেন ? 'বুলা জানতে চাইল।

—কিছুই না।

আবার চুপচাপ। পথের ধারে বৃষ্টি-ধোয়া শ্যাম লতার বন। বুলার হাতে সানাই ফুল দুলছে লীলা-কমলের মতো। বৃষ্টি আর কুয়াশার পরে মেঘের কোলে রোদের রঙ ধরেছে, কিন্তু সূর্য এখনো সম্পূর্ণ দেখা দেয়নি। বিষণ্ণ ছাউনি-হিলের ওপরে একটা রক্তিম পাণ্ডুর ছায়া দুলছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা মিষ্টি ঘণ্টার শব্দ উঠল। যেন যান্ত্রিক আওয়াজ নয়—একরাশ ঝর্ণা জলতরঙ্গ বাজিয়ে তুলল পাহাড়ের বুকের মধ্যে, শান্ত স্তব্ধ সকালটিকে সুরের মাধুর্য দিয়ে আচ্ছন্ন করে দিলে।

বুলা চমকে বললে, ও কিসের আওয়াজ ?

—লামার মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।

—লামা কে ?

—এখানকারই একজন ভদ্রলোক। ভারী ধার্মিক মানুষ—বৌদ্ধ। পাহাড়ের জন্যে দেখতে পাচ্ছেন না—ওই গাছগুলো ছাড়িয়ে একটা আপেলের বাগান আছে, তার পেছনেই ওঁর বাড়ী।

বুলা বললে, বেশ লাগছে ঘণ্টার শব্দটা।

অশোক সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

ছাউনি-হিলের ওপর রক্তিম পাণ্ডুর ছায়া দুলছে। পাহাড়ের বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের ঝঙ্কার। দুটো একটা পাখির কলধ্বনি। বুলা একবার অশোকের দিকে তাকালো, অশোক তাকালো বুলার দিকে। বুলার চোখ দুটোকে আর চেনা যাচ্ছে না—কেমন একটা স্বচ্ছ পর্দা নেমে এসেছে তাদের ওপর।

বুলা হঠাৎ অশোকের একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিলে। ফিস্‌ফিস করে বললে, অশোকবাবু!

শিউরে উঠে অশোক বললে, বলুন।

—এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

—বেশ তো, থাকুন।—চারদিকে তাকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবল অশোক, পারল না। বুলা বললে, কোথায় থাকব?

অশোক নিজেই কথাটা বললে, না তার কানে কানে আর কেউ ওটা বলে দিল, অশোক টের পেল না। মৃদু গভীর গলায় বললে, বেশ তো থাকুন আমার কাছেই।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বুলা ছুঁড়ে দিলে অশোকের হাতটা। এত জোরে, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে যে, অশোকের মুখের ওপর যেন বুলার একটা চড় পড়ল এসে।

—পাহাড়ে থেকে থেকে আপনারা সত্যিই বুনো হয়ে গেছেন—মেশা যায় না আপনাদের সঙ্গে।—সাপের ছোবলের মতো তিক্ত তীক্ষ্ণ শব্দ একটা। চকিতে অশোক তাকিয়ে দেখল—হন্ হন্ করে সে সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে হেঁটে চলেছে এবার, হাতের শানাই ফুলটা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দিচ্ছে মাটীতে।

নীচ থেকে আবার একরাশ কুয়াশা কুণ্ডলিত হয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। অশোক অনুভব করল, বুলার ভেতরেও এই আলো আর কুয়াশার একটা খেলা শুরু হয়ে গেছে।

সাত

ডাক্তার জানতে চাইল : আসব ?

পর্দার ওপার থেকে সাড়া এল : আসুন।

বালিশে একটা কনুই রেখে, গলা পর্যন্ত লাল কম্বলটা টেনে দিয়ে আধ-শোয়ার মতো বসেছিল সাইলি। ডাক্তার ঢুকতেই উঠে বসবার চেষ্টা করল। ডাক্তার বললে, বসবার দরকার নেই। শুয়েই থাকুন।

—শুয়ে তো আছিই সারাদিন।—সাইলি মলিন হাসি হাসল : একটু বসি এখন।

ডাক্তার সামনের চেয়ারটায় আসন নিলে। তারপর কনকনে খানিকটা বাতাসের ছোঁয়ায় চমকে উঠল হঠাৎ।

—ও কী করেছেন! খুলে রেখেছেন কেন জানালাটা ?

—অনেকখানি আলো আসছে ডাক্তারবাবু—আর অনেকখানি হাওয়া। দেখুন—কতদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে!

—কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে।

—ঠাণ্ডায় আমার আর ভয় নেই ডাক্তারবাবু। কতটুকু আর ক্ষতি করবে!

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ডাক্তার, সাইলির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। মনে হল : সেই ভালো। পৃথিবীর সব রঙ মুছে যাওয়ার আগে চোখ ভরে একবার আলো দেখে নিক মেয়েটা, সব বাতাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের বুকের ভেতরটা ভরে নিক হাওয়ায়।

—ক্যাপ্টেন কোথায় ?—একটু পরে জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার।

—সকালের বাসে দার্জিলিং গেছে—পেনসন্ আনতে।

—তার মানে একরাশ মদ গিলে ফিরবে সন্ধ্যাবেলায়।

সাইলি হাসল। সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি।

—কী আর করবে ? একটা কিছু নিয়ে তো ওর থাকা চাই।

—বিয়ে-থা করুক, ঘর-সংসার করুক।—উপদেশের ভঙ্গিতে বললে ডাক্তার। কিন্তু কথাটা এত বেসুরো শোনালো যে নিজের কানেই খারাপ লাগল তার। ক্যাপ্টেনের অভিভাবক সে নয়।

—বিয়ে ও করবে না। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মেয়েদের ওপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে। বলে, দেখেছি জাতটাকে। ছিঃ-ছিঃ—ওদের নিয়ে ঘর করা যায়! আর আমাকে বলে, যেগুলো ভালো হয়, সেগুলো হয় আবার তোর মতো বেকুব। কী হবে ঝামেলা বাড়িয়ে ? বেশ তো আছি।

সত্যিই বেশ আছে এরা—ডাক্তার ভাবল। একজন পুরুষ-জাতকে ঘৃণা করে—আর একজন মেয়েদের ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে আছে। আর তিলে তিলে মরে যাচ্ছে দু'জনেই। টি-বি তে আর অ্যাল্‌কোহলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে থেকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, কোটের কলার তুলে দিল ডাক্তার। দূরের পাহাড়ের মাথায় রোদ জ্বলছে, নীচে সবুজ অরণ্যে থমকে আছে কুয়াশা। লামার মন্দির থেকে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ। ওই ঘণ্টার ধ্বনিটা আশ্চর্য গভীর আর অর্থবহ বলে মনে হল ডাক্তারের।

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল ডাক্তার। তারপর ফিরে এল নিজের জগতে।

—আজ সকালে টেম্পারেচার কত ?

—সেই একশো এক।

একটু কাত হয়ে বসল সাইলি আর জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়ল মুখে। রুক্ষ চুল লাল হয়ে উঠল, শীর্ণ শুকনো মুখের উপর কৃত্রিম রক্তের উচ্ছ্বাস তুলে উঠল খানিকটা। শী ইজ টু ইয়ং—টু ইয়ং ফর ডেথ্‌।

—ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক মতো ?

—খাচ্ছি। কিন্তু খেলেই বা কী হবে ডাক্তার বাবু ? আপনি নিজেই জানেন—

দুটো বিষণ্ণ চোখ সাইলির মুখের উপর কিছুক্ষণ মেলে রাখল ডাক্তার। তারপর আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁ, জানি। জানি—জীবনটা কত দামি জিনিস। আর জানি কী তার শক্তি—কিছুতেই সে হার মানে না।

—আর যখন হেরে বসে আছে?—সাইলি ঠিক হাসল না, মৃদু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোনায় বাঁক নিলে একটু। ডাক্তারের মনে পড়ল, দার্জিলিঙে সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পর্যন্ত পড়েছিল সাইলি, তারপর পৃথিবীটাকে অনেক বেশি সে দেখেছে, অনেকখানি বুঝতে পেরেছে। বড্ড তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গ হয়েছে তার।

—হারতে সে জানে না।—ডাক্তার পকেট থেকে চুরুট বার করতে যাচ্ছিল, সেইখানেই মুঠো করে ধরল হাতটা। যেন নিজের বিশ্বাসটাকেই কঠিনভাবে আঁকড়ে রাখতে চাইছে।

—তার মানে আমি বাঁচব?

—আপনাকে বাঁচতেই হবে।

সাইলির ঠোঁটের বাঁকা রেখাগুলো মিলিয়ে গেল, করুণ বেদনা ঘনিয়ে এল সেখানে।

—ডাক্তার বাবু, আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে কী লাভ? দাদা রাগ করে—তাই ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু আমি তো জানি—

—না, আপনি জানেন না।—ডাক্তারের স্বর শক্ত হয়ে উঠল: আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আপনাকে আমি বাঁচাব।

—কিন্তু বেঁচে আমার কী লাভ? আমি তো বাঁচতে চাই না।

সাইলির রুক্ষ চুলে লাল আলোর ঝলক—শীর্ণ মুখের উপর রক্তের সেই কৃত্রিম উচ্ছ্বাস। লামার মন্দিরে সেই গভীর গম্ভীর ঘণ্টার শব্দ। ডাক্তার প্রায় নিঃশব্দ কোমল গলায় বললে, আমার লাভ আছে।

সাইলির চোখ চমকে উঠল। একবার নড়ে উঠল সে। ভয়ের ছায়া দুলে গেল মুখের উপর দিয়ে।

—ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। সবল, উত্তপ্ত একখানা হাত একবার রাখল সাইলির কপালে। তারপর অনেক কথা যেন এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে এমনিভাবে কিছুক্ষণ করুণ আর তৃষার্ত দৃষ্টি মেলে রাখল সাইলির চোখে। পাথর হয়ে বসে রইল সাইলি।

এক মিনিটেরও কম।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো ডাক্তার। মুখ ফিরিয়ে বললে, আবার কাল আসব। তোমাকে আমি বাঁচাবোই।

দু'হাতে চোখ ঢাকল সাইলি। তারপর মুখ গুঁজল বালিশে। কাঁদছে।

সে কান্নায় বাধা দিলে না ডাক্তার। ফিরে এল বিছানার কাছে। জানালাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর লাল কম্বলটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল সাইলির। আবার বললে, কাল আমি আসব।

ডাক্তার বেরিয়ে গেল। আর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সাইলির মনে হতে লাগল: কলকাতার ফিল্ম-স্টুডিয়োতে যেন আবার একটা নতুন ছবিতে অভিনয় করতে নেমেছে সে। সেই ভয়, সেই উত্তেজনা, রক্তের ভিতর সেই ঢেউ; চারদিকটা কেমন অবাস্তবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—একরাশ তীব্র আলো আশপাশ থেকে তার উপরে এসে পড়েছে, মোটা গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে: মনিটার।

দিন তিনেক কোনো ঘটনা ঘটল না অশোকের পোস্টমাস্টারির জীবনে। বুলার দেখা পাওয়া গেল না—অনুপমেরও না। অনুপম এম্‌নিতেই অসামাজিক—নিজের বই আর কতগুলো লতাপাতার মধ্যে ডুবে থাকে। ভদ্রতা রাখত বুলাই। কিন্তু তিনদিন ধরে বুলাও আর আসছে না।

খুব সম্ভব দাদার কাজে সে সাহায্য করছে—নোট তৈরী করেছে তার জন্যে। সেই ভালো। একটা আলাদা বৃত্তের মধ্যে

ওরা বাস করে—সে ওদের নিজস্ব জগৎ। সেখানে আর কাউকে যেমন ওরা চায়না, তেমনি ওদের ভিতরে যারা গিয়ে পড়বে—তারাও শান্তি পাবে না কেউ। নিজেদের নিয়েই ওরা থাকুক।

কিন্তু ওরা না এলেই বোধ হয় ভালো করত ছাউনি-হিলে। এই পাহাড়—এই মেঘ—এই ঝর্ণা—এরা সবাই মিলে একটা আলাদা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানকার মানুষ এর মধ্যে মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের, এখানকার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। কিন্তু ওরা এখানে একান্ত বেমানান। নিজেরাই শুধু বাইরে থেকে এসেছে তা নয়—বাইরের একটা জটিল মনকেও ছড়িয়ে দিয়েছে ছাউনি-হিলের হাওয়ায় হাওয়ায়।

ওদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের এখানে না থাকাই ভালো। এই পাহাড়ে ওরা অনধিকারী। ছন্দ ভেঙে দিয়েছে—সুর কেটে দিয়েছে।

ডাক নিয়ে চলে গেছে সবাই। সরোজ, শৈলেশ, চ্যাটার্জি—সকলেই। শুধু ডাক্তার আসেনি—কৌশিকও না। বারো নম্বরের আজও খান দুই চিঠি ছিল, অশোক আগে ভাগেই সে-দুটো পাঠিয়ে দিয়েছে কাঞ্ছার হাত দিয়ে। বুলা এসে এখানে হাজির হয়—তা আর সে চায় না। মেয়েটাকে দেখলে এখন তার শুধু ভয় করে না—অস্বস্তিও বোধ হয়। সেই ছেঁড়া শানাই ফুলের সকালটি তার মনের উপরে চেপে বসে আছে।

আজ শুধু একটা আশাপ্রদ খবর আছে। দু'খানি চিঠি পেয়েছেন শৈলেশ। একখানা স্ত্রীর কাছ থেকে—আর একখানা ছুটির মঞ্জুরী।

শৈলেশের প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজ বলেছে, দাদা—খাওয়াও।

শৈলেশ ছেলে মানুষের মতো লজ্জা পেয়ে বলেছেন, কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

চ্যাটার্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে একটা!

—কলকাতায় পুরো লীগের খেলা চলেছে এখন। শৈলেশদা মজা করে খেলা দেখবে। খবরের কাগজ আর রেডিয়ো ছাড়া কোনো সান্ত্বনাই রইল না আমাদের।

শৈলেশ বহুদিন পরে সরস হয়ে উঠেছেন : আরে রেখে দাও খেলা। খেলা তো নয় যেন কম্যুনাল রায়ট। ওকি ভদ্রলোকের জিনিস ? দেদার নতুন ফিল্ম এসেছে কলকাতায়—প্রাণ ভরে ছবি দেখব !

—বৌদিকে নিয়ে নিশ্চয়ই ?—সরোজের জিজ্ঞাসা।

—আলবৎ। সস্ত্রীকো ধর্ম্মাচরেৎ !—খুসিতে জ্বলজ্বলে মুখে শৈলেশ বলেছেন : তোদের মতো স্বার্থপর নাকি আমরা ?

সকালে অশোক বসে বসে শৈলেশের পরিতৃপ্ত মুখের কথাই ভাবছিল। কয়েকদিন পরেই শৈলেশ চলে যাবেন—এক মাসের ছুটি আপাতত—তারপরে হয়তো ট্রান্সফার হয়ে যাবেন, আর হয়তো ফিরেই আসবেন না ছাউনি-হিলে। আর অশোককে কতদিন এখানে পড়ে থাকতে হবে কে জানে ! এই দীর্ঘ বিলম্বিত মন্থর দিনগুলো, এই মেঘ বৃষ্টি—

নাঃ, সত্যিই আর থাকা যায় না ছাউনি-হিলে। এবার তাকেও বদলির চেষ্টা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কলকাতার একটা সুদূর আকর্ষণে তার নাড়ীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

শেল্‌ফ থেকে কবিতার বই টেনে নিলে অশোক। খুলতেই কয়েকটা লাইন ভেসে উঠল চোখের সামনে। গভীর নিরাশা আর একান্ত শূন্যতা যেন একরাশ কালো হরফের মধ্য দিয়ে ঠিকরে এল চোখের সামনে :

"Ce pays noun ennuine, O' Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de I' encre—"

'এই দেশ আমাদের ক্লান্ত করে তুলছে—হে মৃত্যু, আমাদের প্রস্তুত করো। রাত আর সমুদ্র যেন কালির মতো নিবিড় কালো—'

এই দেশ ক্লান্ত করে তুলছে—হে মৃত্যু ! কিন্তু অশোক তো

মৃত্যুকে চায় না। পরের লাইনে আসতেই তার চোখ থমকে গেল ঃ

"Nos Coeurs que tu connais sont remplis de rayons !"

'হে বন্ধু, তবু তুমি তো জানো, সূর্যের আলোয় আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।'

—অশোক বাবু!

বুলার ডাক। ভয়ঙ্করভাবে চম্‌কে উঠে দাঁড়ালো অশোক। ঠিক এই মানুষটিকেই সে কোনোভাবে প্রত্যাশা করেনি।

—আসুন।

বুলা পোস্ট অফিসের দরজায় পা দিলে। কোটের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপে বাঁধা একটা ক্যামেরা ঝুলছে। চোখে নীল গগল্‌স্।

বুলা বললে, আমি আসব না—আপনি আসুন।

—তার মানে? ছবি তুলতে এলেন নাকি? কিন্তু আমাকে ছাড়া কি আর সাব্‌জেক্ট্‌ পেলেন না ছাউনি-হিলে?—জোর করে সহজ হতে চাইল অশোক। বুলা যদি পারে, সেও পারবে।

বুলা ভ্রূ কোঁচকালো।

—আপনার ছবি তুলে ফিলিম নষ্ট করতে আমার বয়ে গেছে। একটা কোট-ফোট চাপিয়ে চটপট চলে আসুন। অনেক দূরে যেতে হবে। দাদা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে।

—দার্জিলিঙে বেড়াতে যাচ্ছেন? তা আমাকে কেন? যান না—ঘুরে আসুন।

—আঃ, বড্ড তর্ক করেন আপনি। পোস্ট্‌ অফিসের লোক আপনারা—পাব্‌লিকের সঙ্গে আর্গুমেন্ট্‌ করা যে আপনাদের কোডে বারণ সেটা খেয়াল নেই বুঝি? নিন, চলুন। হোল্‌-ডে প্রোগ্রাম।

—সেকি! সব কাজ ফেলে!

—রবিবারে আবার কী কাজ? বুলার সুন্দর মুখে বিরক্তির ছায়া পড়ল ঃ ভেবেছেন, আপনার শেল্‌ফ্‌ আমি লক্ষ্য করিনি?

বসে বসে তো খালি ইংরেজী আর ফ্রেঞ্চ্ কবিতার বই পড়বেন। আল্‌সেমির চূড়ান্ত। উঠুন শিগ্‌গীর—

—স্টোভে ভাত চাপিয়েছি যে!

—সে রাজভোগ তো রোজই খাচ্ছেন, একদিন নয় বাদই পড়ল। ভয় নেই, উপোস করিয়ে রাখব না।

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু! এমন বাজে লোক তো দেখিনি। শুনুন—তিন মিনিট টাইম দিচ্ছি। এই ঘড়ি ধরলাম—তিন মিনিটের এক সেকেণ্ড বেশি দেরী হলে আপনার সাধের পোস্ট্ অফিসের সমস্ত কাগজপত্তর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। কোনো অপ্‌শন্ নেই।

—দেখুন, দার্জিলিং আমার একদম ভালো লাগে না।—বিব্রত ভাবে অশোক শেষ চেষ্টা করল ঃ দয়া করে—

বুলা মণিবন্ধের ছোট্ট ঘড়িটির দিকে তাকালো।

—আধ মিনিট প্রায় হল। আর ছু মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড। এর মধ্যে যদি তৈরী না হন তাহলে যত কাগজপত্র—

—সর্বনাশ, আমার চাকরি শেষ করবেন দেখছি!—অশোক সভয়ে বললে, দাঁড়ান, দেখছি।

ঠিক ছু মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ডে হল না, আরো মিনিট পাঁচেক লাগল। পিয়নকে ডেকে চাবিটা দিয়ে, স্টোভ নিবিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল অশোককে। একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল।

—ভাতটা গেল!

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচের রাস্তার দিকে নামতে নামতে বুলা বললে, আহা কী ছুঃখের কথা! নিজের হাতে রান্না করা ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধর এমন অমৃত ফস্‌কে গেল আজকে! কিচ্ছু ভাববেন না। একটা মস্ত বেড়াল ঘুরঘুর করছে দেখলাম, সেই ম্যানেজ করে নেবে এখন।

গাড়ীর সামনে অনুপম দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। হেসে বললে, ঠিক ধরে এনেছে তো আপনাকে!

—কী করা যায় বলুন! আমার অফিস রেইড্ করতে যাচ্ছিলেন বুলা দেবী। চাকরির মায়াতেই আসতে হল।

অনুপম খুশি হয়ে বললে, খুব ভালো হয়েছে। চলুন।

অনুপমের পাশে দরজা খুলে উঠতে যাচ্ছিল অশোক, বুলা বললে, বাঃ, বেশ তো! আমি একা বসে থাকব পেছনে? সে হবেনা—ব্যাক্ সীটে আসুন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা করল অশোক। কিন্তু দ্বিধাটাকে অশোভন করে তোলার আগেই উঠে বসল পেছনে। বসল যথাসম্ভব দরজার ধার ঘেঁষে, যথাসম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে। অনুপম স্টার্ট দিলে গাড়ীতে।

চিন্তার মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ তুলছিল অশোকের। সেই সানাই-ফুল ছিঁড়ে ফেলার দুর্বোধ্য সকালটি। লামার মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ। বুলার মুখ লাল হয়ে উঠছিল, চোখ জ্বলছিল অল্প অল্প—তার অর্থ আজো অশোক সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। আর কৌশিক ঘোষের বাড়ীতে সেই বিশ্রী কাণ্ডটা। অতটা উগ্র, অতখানি উত্তেজিত হয়ে সেদিন ওঁদের ও-ভাবে অপমান করবার কোনো দরকার বুলার ছিল না। বুলাকে সে বুঝতে পারে না। রৌদ্র আর কুয়াশার একটা দুর্বোধ্য লীলা চলেছে এই মেয়েটির মনের ভেতর।

বুলা বললে, দাদা, আমার পাঁচ টাকার কথা যেন মনে থাকে।

হাসিমুখ ফেরালো অনুপম।

—সত্যি। অশোকবাবু যে আমার পাঁচটা টাকার ক্ষতি করিয়ে দেবেন ভাবতেই পারিনি।

বুলা বললে, বা-রে, নইলে যে আমার টাকা যেত।

অশোক উৎকর্ণ হয়ে বললে, মানে? আমি কী ক্ষতি করলাম অনুপম বাবুর?

বুলা হেসে উঠল, দাদার সঙ্গে বাজী রেখেছিলাম। দাদা বলেছিল, অশোকবাবু কিছুতেই আসবেন না, তুই দেখে নিস। আমি বলেছিলাম ঠিক ধরে আনব তুমিও দেখে নিয়ো। দাদা বললে, পাঁচ টাকা বাজী।

—এই ব্যাপার?—ছেলেমানুষির খুশিতে ভরা বুলার মুখের দিকে একবার তাকালো অশোকঃ জানলে আমি কখনো আসতাম না।

বুলা বললে, সে আর বলতে হবে না। আপনাকে খুব ভালো করে চিনে নিয়েছি আমি। আমার ক্ষতি করতে পারলে আপনি আর কিছুই চাইবেন না।

কথাটা বুলা হয়তো ভেবে বলেনি—ওর কোনো অর্থ নেই, কেবল বলবার জন্যেই বলা। তবু কেমন বেসুরো লাগল অশোকের কানে। সেই সানাই-ফুল ছিঁড়ে ফেলা সকালটা। কতগুলি দুর্বোধ্য মুহূর্ত।

অশোক হাসতে চেষ্টা করল।

—ক্ষতি আপনার করাই উচিত। যে ভাবে আপনি আমার পোস্ট্ অফিসে রেইড্ করেছিলেন—

—বেশ করেছি। যে রকম লোক আপনি!

—খুব খারাপ লোক বুঝি?

সামনের পাহাড়ী পথের ওপর চোখ রেখে অনুপম বললে, কী হচ্ছে বুলু? ঝগড়া করবার জন্যেই কি তুই অশোকবাবুকে ডেকে আনলি?

—দাদা, তুমিও ওঁর দলে? পুরুষ জাতটাই এমনি কম্যুনাল!

স্বল্পভাষী অনুপম জবাব আর দিল না। তার চোখের দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হচ্ছে, সমস্ত মন এখন ব্রেক আর স্টিয়ারিঙের ওপর। বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে। ছাউনি-হিলের এরিয়া শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে জঙ্গল। পথের একদিকে পুরোনো গ্রীক মন্দিরের থামের মতো জাপানী পাইনের সারি উঠেছে—ছড়িয়ে রেখেছে শীতল ঘন ছায়া। অল্প অল্প হাওয়ায় তার শুকনো কর্কশ পাতায় আওয়াজ উঠছে খরখরিয়ে। আর একদিকে টাইগার ফার্ণের ঝোপ, থোকা থোকা ফুল, এলোমেলো বড় বড় গাছ। গ্রীন পিজিয়ন ডাকছে ডালে ডালে। এখান ওখান থেকে ছোট ছোট সর্পিল

ঝর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়েছে—পথের উপর দিয়েই নেমে চলেছে রূপালি স্রোত।

হালকা আলোচনার খেইটা হারিয়ে গেল।

খানিক পরেই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বুলা।

—দেখুন—দেখুন—কী চমৎকার—

দেখবার মতোই বটে। একরাশ ফুলের পাঁপড়ি উড়ছে চারিদিকে। যেন নানা রঙের সীজন ফ্লাওয়ারকে ছিঁড়ে মুঠোয় মুঠোয় উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। প্রজাপতি।

—ইস্, কী সুন্দর—কী সুন্দর!—বুলার খুশি উচ্ছলিত হয়ে উঠল: এসব দেখলে সত্যিই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

—বেশ তো, লিখুন না।

—সর্বনাশ, আমি লিখব কবিতা! একটা চিঠিই লিখতে পারি না ভালো করে। মানুষ যে কী করে এত কথা বানায় আর এমন সাজিয়ে সাজিয়ে লেখে—সে আমি ভেবেই পাইনা। তাই আপনাকে আমার হিংসে হয়।

—আমাকে হিংসে কেন?

—আপনি কবি।

অশোক চকিত হল।

—আমি কবি? এ খবর শুনলেন কার কাছ থেকে?

প্রজাপতির ঝাঁক ফিকে হয়ে এসেছে। আবার পাইন বনের ঘন গম্ভীর ছায়া, পথের ওপর আছড়ে পড়া ঝর্ণার ঝিলিমিলি। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে, সামনে আঁকাবাঁকা পথের ওপর সজাগ চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছে অনুপম। গাড়ীর পেছনে তার দৃষ্টি রাখবার সময় নেই, কানও না। বরং পথের ধারে ধারে তার সন্ধানী চোখ রেয়ার হার্ব্সের খোঁজ করে চলেছে।

বুলা হেসে উঠল।

—ইচ্ছে করলেই কি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন? সরোজবাবু বলেছেন আমাকে।

সরোজ! একটা চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল অশোকের মন। সরোজকে ঠিক বিশ্বাস নেই। মুখ আল্‌গা—যখন যা খুশি বলে ফেলে। আরো কিছু বলেছে নাকি বুলাকে? তার কাছে এসে যে-সব আবোল-তাবোল বকছিল, তার কোনো আভাসও দিয়েছে নাকি ওর কাছে?

অনিশ্চিত ভাবে একটু চুপ করে রইল অশোক। তারপর ঃ

—আমি এখন আর কবিতা লিখিনা।

—কেন লেখেন না?

—সে মনটাই বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি।

—কী করে হারালেন?

আশ্চর্য ছেলেমানুষি প্রশ্ন। অথবা বুলার মনটাই বৈজ্ঞানিক। সব জিনিসকেই স্থূলভাবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝতে চায়। অশোক হাসল।

—কী করে হারিয়েছি বলতে পারব না। কিন্তু কবিতা আর আসে না। এখন ভাবি, একটা উপন্যাস লিখব কোনো সময়।

উপন্যাস লিখবেন?—বুলার চোখ চক চক করে উঠল ঃ লিখবেন আমাদের কথাও?

অশোক লঘু ভঙ্গিতে বললে, আপনাকেই না হয় সে উপন্যাসের নায়িকা করা যাবে।

—আমাকে নায়িকা? নায়িকা হওয়ার মতো কী গুণ আছে আমার?

—সে আপনি কেমন করে জানবেন? নিজেকে কি কেউ দেখতে পায়?

আবার চুপচাপ। একটা জবাব সহজভাবে বুলা দেবে—অশোক আশা করেছিল। কিন্তু বুলা কী ভাবছিল কে জানে—বাইরে চোখ মেলে বসে রইল কিছুক্ষণ। গাড়ী জঙ্গলের পথ ছাড়িয়ে উঠে এল ছ' নম্বর বস্তির সামনে। বাঁ দিকের রাস্তা চলে গেছে ঘুম হয়ে দার্জিলিং, ডানদিকের রাস্তা এঁকে বেঁকে কালিম্পংয়ের যাত্রী।

গাড়ী এগিয়ে চলল ঘুমের দিকে। একপাশে খাড়া পাহাড়ের আড়াল, তার একদিকে অতলান্ত খাদ। ফগ্-মাখানো অনন্ত শূন্যতার দিকে তাকালে মাথা ঘুরে আসতে চায়। সেই মহাশূন্যতার মধ্যে বাতাসের অদ্ভুত ধ্বনি উঠছে—যেন রুদ্র সৌন্দর্যের তারযন্ত্রে ঝঙ্কার তুলছে হিমালয়।

বিনা হর্ণে একটা বাস এমন আচমকা সামনে এসে পড়ল যে বিহ্বল অনুপম ব্রেক কষল প্রাণপণে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল একটা, চিৎকার করে উঠল বুলা—দু' হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল অশোককে। ডান পাশের খাদের এক হাতের মধ্যে গিয়ে গাড়ী থমকে দাঁড়ালো। মৃত্যুর হাতখানা ঠিক মাথার উপর নেমে এসেই পলকে সরে গেল।

এক মিনিট। দু' মিনিট।

বাস দাঁড়ালো না—বেরিয়ে গেল দ্রুতগতিতে। দাঁড়ানো সুবুদ্ধির নয় ভাবল বাসের ড্রাইভার। পাথর হয়ে বসে থাকা অনুপম বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপাল মুছে ফেলল, এই শীতেও ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছিল সেখানে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বিবর্ণ হাসি হাসল : একটুর জন্য।

নিজেকে সামলে নিয়ে সরে বসেছে বুলা। কিন্তু সম্পূর্ণ ছাড়েনি অশোককে। তখনো ভরসা পায়নি, উষ্ণ, নরম ভয়ার্ত মুঠোর মধ্যে একখানা হাত চেপে ধরেছে অশোকের।

অশোকও হাসতে চেষ্টা করল : হাঁ, আর একটু হলেই এক সঙ্গে সবাই মিলে ওপারে যাত্রা করা যেত।

অশোকের হাতে বুলার মুঠিটা কেঁপে উঠল একবার।

—দাদা, ফিরে চলো।

অনুপম বললে, সেকি! দার্জিলিং যাব না?

—না। দরকার নেই।

এবার অশোকের হাত বুলার হাতে এসে মিলল। নরম আঙুল-গুলোতে আস্তে চাপ দিল অশোক।

বললে, ভাবনা নেই। এক যাত্রায় দুবার অ্যাক্সিডেন্ট্‌ ঘটে না।

দার্জিলিং পর্যন্ত দুজনের হাত আর্‌ খুলল না। একটা নিঃশব্দ সন্ধির মতো মিশে রইল একসঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় দার্জিলিঙের কথাই ভাবছিল অশোক।

সেই মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন সুর কেটে গিয়েছিল। বেড়ানো হল, খাওয়া হল, কিন্তু কেমন যেন ছায়া ঘনিয়ে রইল সব কিছুর ওপর।

তারপর বটানিক্‌স্‌।

আশ্চর্য নির্জন ছিল বটানিক্‌স্‌। ফুল আর গাছ আর ছায়া, আর রৌদ্র মেঘের আনাগোনা। অনুপমের মন এখানে এসে যেন মুক্তি পেয়েছিল খানিকটা, নিজের চেনা জগতের ভেতর এসে গাছ-পালার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল সে—রাশি রাশি ল্যাটিন নামের মধ্যে তার কৌতূহলী চোখ মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। খানিক পরে বুলা বলেছিল, আর তো পারা যায় না দাদা! পা যে ব্যথা হয়ে গেল! তুমি এবার ঘোরো, আমরা এখানে এই বেঞ্চিতে বসি।

অনুপম বলেছিল, আচ্ছা বোস। আমি দশ মিনিট ওই রক্‌ গার্ডেনটা একটু ঘুরে আসি।

অনুপম চলে যাওয়ার পর অশোক আর বুলা বসেছিল পাশা-পাশি। চারদিক আশ্চর্য নির্জন—আশ্চর্য সুন্দর। শুধু্‌ পাইনের পাতার মর্মর শব্দ। বুলা বলেছিল, অশোকবাবু—

—অশোক!

—কে? ভাবনা থামিয়ে চমকে অশোক ফিরে তাকালো।

ডাক্তার।

—খবর কী ডাক্তার? আসুন।

—কাগজটা নিতে এলাম। চিঠিপত্র আছে নাকি কিছু?

—বসুন, দিচ্ছি—দ্রুত সরে গেল অশোক—নিজের মনের ছায়া পড়েছে মুখে, ডাক্তারের দৃষ্টি এড়ানো দরকার।

উঠে গিয়ে অফিস থেকে অশোক ডাক্তারের ডাক নিয়ে এল। খুঁজতে এবং গুছিয়ে নিতে দেরী হল মিনিট পাঁচেক।—এসে দেখল, ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে—কেমন নিবিড় চিন্তায় মগ্ন। অশোকের মনে হল, ভালোই হয়েছে—ডাক্তার তার দিকে লক্ষ্য করেনি।

অশোক বললে, এই নিন্।

পরমাশ্চর্য ব্যাপার, কাগজটা পেয়েই লুব্ধের মতো ডাক্তার তার ভাঁজ খুলল না। সেটা কোলের ওপর ফেলে রেখে, ঘরের ম্লান আলোর মধ্যে মুখের ধোঁয়া রিং করে করে ছেড়ে দিতে লাগল।

অশোক বললে, কী ভাবছেন?

ডাক্তার বললে, বোসো, কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ছেঁড়া ইজিচেয়ারটায় ব্যালান্স করে অশোক বসল: কী হয়েছে?

—তুমি ফিল্ম স্টার মিস্ আলেয়ার নাম শুনেছ?

—ফিল্ম স্টার!—কথাটা অশোক যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ভূতের মুখে রামনামের চাইতেও কথাটা ভয়াবহ মনে হল তার। ডাক্তার চাইছে ফিল্ম-স্টারের খবর! জীবনে দু'তিন বারের বেশি যে সিনেমা দেখেছে কিনা সন্দেহ!

—আপনি ফিল্ম-স্টারের কথা বলছেন দাদা?

ডাক্তার ধোঁয়ার রিঙের দিকে চোখ রেখেই বললেন, হুঁ—আলেয়া দেবী।

—আলেয়া দেবী!—অশোক হা হা করে হেসে উঠল: দাদা, এখানে আপনাকেই তো সবচেয়ে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বলে জানতাম। শেষ কালে আপনারও এই অধোগতি! আপনিও কিনা আলেয়ার পেছনে ছুটতে শুরু করে দিলেন! আমরা আর কার ওপরে ভরসা রাখি বলুন তো।

ডাক্তার কিন্তু কুণ্ঠিত হল না। গভীর বিষণ্ণতায় তার চোখ মুখ ভরে গেছে।

—তুমি তার ফিল্ম দেখোনি?

—না। কাগজে দু একবার হয়তো নাম দেখে থাকব। যতদূর মনে হচ্ছে, খুব উজ্জ্বল কোনো তারকা নয়।

—ওঃ!—ডাক্তার চুপ করে রইল।

—কী হয়েছে বলুন তো দাদা? যেন রহস্যের খাসমহল সৃষ্টি করছেন একটা।

ডাক্তার একবার বাইরের দিকে তাকালো। ছাউনি-হিলে বিকেলের ছায়া। পোস্ট অফিসের সামনে একটা শীর্ণ ডালিম গাছে একরাশ ফুল ধরেছে। সিগারেটটায় আরো দুটো একটা টান দিয়ে, শেষ হওয়ার আগেই সেটাকে বাইরে ছুড়ে ফেলে ডাক্তার বললে, ফিল্মের মেয়েরা খুব খারাপ হয়—তাই না?

অশোক হাসল: আপনি কি ওদের জন্যে স্যাল্ভেসন আর্মি খুলছেন ডাক্তার?

—ঠাট্টা কোরো না। ওরা কি খুব খারাপ হয় বাস্তবিক?

—দাদা, এসব কূট প্রশ্ন আমাকে কেন? সাধারণ ভালো মন্দের স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মানুষকে আমি দেখি না। তবে চল্তি অর্থে যদি বলেন, ওদের অনেকেই সেদিক থেকে খুব নির্মল থাকে না—এটা অনেকের মুখেই শুনেছি।

—ওরা কি ভাল হতে পারে না?

—পারে বই কি। মানুষ তো ভালো হতেই চায়।—অশোক খানিকটা বাঁধা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে, শুধু ভালো হওয়ার সুযোগ দিতে হয় মানুষকে—সেইটেই আসল কথা। এক যারা শারীরিক ডিফেক্ট নিয়ে জন্মেছে, কিংবা মনস্তাত্ত্বিক কারণে যারা পুরো ক্রিমিন্যাল হয়ে দাঁড়িয়েছে—তারা ছাড়া সবাই-ই ভালো হতে পারে দাদা—একেবারে আপনার-আমার মতো ভদ্রলোক হতে পারে। কিন্তু আমি মিথ্যেই বকে মরছি, এ-সব আমার চাইতে ঢের বেশি করে জানেন আপনি।

—ফিল্ম-স্টারকে বিয়ে-করা চলে?

—দাদা !

অশোক আছড়ে পড়ল আকাশ থেকে।

—সত্যিই কি আপনি বিয়ে করবেন নাকি ? ফিল্ম-স্টারকে ?

—তাই ভাবছি।

—মিস্ আলেয়াকে ?

—সেই রকমই তো ইচ্ছে।

—কোথায় পেলেন তাকে ?—ডাক্তার কি ঠাট্টা করছেন তাকে ? অশোক ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ডাক্তারকে যতখানি সে জানে ঠিক এই ধরনের ঠাট্টার অভ্যাস তো তার নেই।

ডাক্তার সংক্ষেপে বললে, মেয়েটা ক্যাপ্টেনের বোন।

—অ্যাঁ !—

ছেঁড়া ইজি চেয়ারটাকে অনেকখানি ব্যালান্স করে বসেছিল অশোক, এবার সে ব্যালান্স আর রাখতে পারল না। পট্ পট্ করে একটা আওয়াজ হলো—সময়মতো তড়াক করে দাঁড়িয়ে না উঠলে ছিঁড়ে নীচে পড়তে হত তাকে।

ডাক্তার বললে, তার নাম সাইলি।

—মাই গড্ ! দাদা—এ যে রীতিমতো নাটক !

—তাই বটে !—ডাক্তার বাইরের ডালিম গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল, কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে এসেছে তার চোখের দৃষ্টি। অশোক লক্ষ্য করে করে দেখল সে মুখে পূর্বরাগ নেই—রোমান্স নেই—কোনো রক্তের চঞ্চলতাও নেই। শুধু বেদনার কোমল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মুখ।

অশোক বললে, তা হলে বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

—হয়তো হবে না। হয়তো কেন, না হওয়ার সম্ভাবনাই ষোলো আনা। মেয়েটার টি-বি। সব শেষ করে দিয়ে এখানে এসেছে।

—দাদা ?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কী জানো অশোক ? তবু যেন

কোথাও আশা আছে একটা। বাঁচবে না ঠিকই—তবুও বেঁচে যেতে পারে। কত অলৌকিক ঘটনাই তো ঘটে—ঘটুক না আরো একটা। সংসারে তাতে তো কারো কোনো ক্ষতি নেই।—ডাক্তারের গলার স্বর ভিজে ভিজে হয়ে এলঃ তুমি বিশ্বাস করবে, গত দু'দিন থেকে মেয়েটা বেশ ইম্প্রুভ করছে?

অশোক টেবিলের কোণা ধরে মূঢ়ের মতো চেয়ে রইল।

ডাক্তার বলে চলল, এমনও হতে পারে—আর তাই হওয়াই সম্ভব—হয়তো নেভবার আগে ওটা শেষ দীপ্তি। কিন্তু উল্টোটাও কি সম্ভব হয় না অশোক? শি ইজ টূ ইয়াং—শি ইজ টূ গুড্। একবার ভুল করেছিল, কিন্তু আজো সে ভুল শোধরাবার সময় আছে। এত তাড়াতাড়ি ওকে মরতে দেব কেন অশোক? কেন মরতে দেব?

কেন মরতে দেব? সে কথা ঠিক। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি আমরা? সমস্ত কামনা, সমস্ত আকুলতা —এমন কি সমস্ত বিজ্ঞান দিয়েও? সারা দেশের মানুষের আকুল ভালোবাসা দিয়েও কি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে ঠেকাতে পেরেছি আমরা?

—চেষ্টা করুন দাদা।—অশোক বলতে পারল কেবল। এক সময়ে নারী সম্পর্কে সে বোদলেয়ারের শিষ্য ছিল, কিন্তু আজ সে কথা সে আর ভাবতেও পারে না।

—চেষ্টা করব বই কি।—ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠলঃ জগতে অনেক মির‍্যাকূল ঘটে গেছে অশোক, আজও আর একটা ঘটতে বাধা নেই। আমি হাল ছাড়ব না।—দরজার দিকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, লেট্ মি ট্রাই!

অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে ডাক্তারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তারপর আরো প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেলে মনের বিমূঢ় অবস্থাটা স্বাভাবিক হয়ে এলো অশোকের। অদ্ভুত এই ছাউনি-হিল! এর একটা নিজস্ব-প্রভাব আছে—আছে সহজ অকৃত্রিমতা।

মানুষের মনে এ মির‍্যাক্‌লের আশা নিয়ে আসে—এর ঘন গভীর অরণ্য যেন আদি সৃষ্টির অসংখ্য বিস্ময়কর বস্তুকে নিজের মধ্যে রেখেছে প্রচ্ছন্ন করে। যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে সেখানে। সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা অতিকায় মন্দির—এর স্তব্ধ রহস্যঘনতার আড়াল থেকে যে-কোনো সময় কোনো অশরীরী কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে গ্রীক-যুগের 'ওর‍্যাক্‌ল' !

আর ডাক্তার তারই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে চলেছেন !

সামনে মৃত্যু—অন্ধকার : O Morte ! তার নির্ভুল আবির্ভাব। তবু ডাক্তারের মন বলছে—"Sont remplis de rayons !"

আশ্চর্য ! অনুপম তো এখানে দুর্মূল্য লতাপাতার গবেষণা করে বেড়াচ্ছে। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে পড়া হিমালয়ের আশ্চর্য বনৌষধি শুধুই কি গল্প-কাহিনী ? তার মধ্যে কোথাও কি কোনো সত্য নেই ? তেমনি একটা কিছু কি আবিষ্কার করতে পারে না অনুপম—বাঁচাতে পারে না সাইলিকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোক উঠে দাঁড়ালো।

ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মাথাটায় ঝিম ধরেছে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের খানিকটা সর্বাঙ্গে মেখে নিতে ইচ্ছে করছে। কোথাও ঘুরে আসা যাক।

কোথায় যাবে ? যেখানে হোক। এই ছাউনি-হিলে নির্জন জায়গার অভাব নেই। যেখানে খুশি যে-কোনো একটা ঝর্ণার কাছে চুপ করে বসে থাকা যায়, দেখা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ সানাই ফুল, লতানে গোলাপ আর হাইড্রেন্‌জিয়ার বুকে পাহাড়ী মৌমাছি আর প্রজাপতির আনাগোনা, মনকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে দূরের পাহাড়ে ঘুমন্ত বনের ওপর স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ানো মেঘগুলোতে।

হাঁটতে হাঁটতে এমনি একটা জায়গাতেই এসে বসল অশোক।

ছাউনি-হিলের ক্ষণ-যৌবনের দিনগুলিতে কে যেন এর নাম দিয়েছিলেন "লাভার্স পার্ক"। নামটা সেদিন একেবারে মিথ্যেও ছিল না, অশোকের মনে হল। অনেক টুকরো টুকরো রোম্যান্টিক্‌

কবিতা সেদিন এখানে গুঞ্জন করেছে। কলকাতার ভিড়ে অনেক দূরে যারা ছিল, এখানে এসে মিলে গেছে তাদের মন। এখানকার ছায়া ছড়ানো গাছগুলো, ঝর্ণার জল, ক্বচিৎ কখনো এক আধজন মানুষের আসা যাওয়া সব তারই অনুকূল।

একটা কালভার্টের উপর চুপ করে বসেছিল অশোক। নিচে পাথরে পাথরে নেচে চলেছে ঝর্ণা, কয়েকটা চাতক পাখা নেড়ে স্নান করে গেল। কালো রঙের বড় একটা পাখি লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হল ঝোপের ভিতর। ঝর্ণার একটানা স্রোতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অশোক ভাবতে লাগল, কী অসম্ভব দুরাশার পেছনেই ছুটেছে ডাক্তার! সাইলিকে বাঁচাবে!

আশ্চর্য এই ছাউনি-হিল। আশ্চর্য এই অরণ্য, আশ্চর্য এখানকার মোহ। এখানে সব কিছু কল্পনা করা চলে, সব কিছুকে বিশ্বাস করা যায়। এ সমতলের জগৎ নয়—যেখানে পরিচয় আর সত্যের বাঁধনে জীবনটা বাঁধা—যেখানে মিরাক্‌লের কোনো সম্ভাবনাকেই মনে জায়গা দেওয়া যায় না। দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে এখানে কোন্ অলৌকিক অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না, এখানকার নিবিড় বনের মধ্যে কোথায় মৃত-সঞ্জীবনী লতাটি একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়ে বসে আছে তার সন্ধান এখনো কেউ পায়নি।

ডাক্তারেরও আশা করতে দোষ নেই।

উপন্যাস লিখতে পারা যায় একে নিয়ে। নইলে মহাকাব্য। কিন্তু মহাকাব্য লিখবার শক্তি অশোকের নেই—উপন্যাসের চেষ্টাই সে করতে পারে বরং।

আর তখন দার্জিলিংয়ের কথা তার মনে পড়ল। সেই বটানিক্‌সের কথা।

সাজানো ফ্লাওয়ার বেডে অসংখ্য মণি-মাণিক্যের মতো ফুলের উৎসব। ছোট এক টুকরো জলের ভিতর আধফোটা লাল শালুক।

বুলা বলেছিল, আমাকে উপন্যাসের নায়িকা করবেন? কতটুকু জানেন আমার?

—বেশি জানি না। আর সেইটেই তো সুবিধে। যত খুশি রঙ চড়াতে পারব কল্পনার ওপর।

বুলার হাতখানা পাশেই পড়েছিল অশোকের। প্রবল প্রলোভন সত্ত্বেও অশোক সে হাতখানাকে মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে পারল না। চলন্ত মোটর নয়—অ্যাক্‌সিডেন্টের ভয় আর নেই। সাহস হল না।

বুলা চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, জানেন আমাদের মা নেই।

অশোক চমকে উঠল।

—সে কি! তবে সে প্রথম দিন—

—সৎমা। মাসীমা তাঁরই বোন। আমাব দশ বছর বয়সের সময় আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন।

অশোক শুনতে লাগল। বুলা তেমনি আস্তে আস্তে বলে চলল, নতুন মা ঘরে এলেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই বাবা বুঝলেন কতবড় ভুল করেছিলেন তিনি। নতুন মা বাবাকে ভালবাসতে পারেন নি কোনদিন—তাঁর মন অন্য কোথাও বাঁধা ছিল। তবু কেন যে তিনি বাবাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন আমি আজও জানি না।

অশোক অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। এ কাহিনী তার শোনবার বোধ হয় দরকার ছিল না—বুলাও হয়তো না বললেই পারত। কিন্তু বাধাও দিতে পারল না। বুলা বলে চলল।

—বাবা মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ক্লাবে যাওয়ার নেশা তাঁর বড্ড বেশি বেড়ে উঠল—মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে মদের যে অভ্যাসটা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইটেই আবার নতুন করে ঝালিয়ে তুললেন। রাত্রে প্রায়ই বারোটা-একটায় ফিরতেন তিনি। তাও স্বাভাবিক অবস্থায় নয়।

বাবার তো ক্লাব ছিল, কিন্তু আমরা দুই ভাই বোন? বাবাকে সামনে পেতেন না বলেই বোধ হয় নতুন মার যত জ্বালা, যত রাগ সব এসে আমাদের ওপরে পড়ত। দাদাকে তো দেখছেনই, কেমন শান্ত, নিরীহ মানুষ। অকারণেই নতুন

মা তার ওপরে অত্যাচার আরম্ভ করলেন। খেতে দিতেন না, যখন তখন মারধোর করতেন। আমাকে অবশ্য বেশি ঘাঁটাতে সাহস করতেন না, আমার চোখ দেখেই হয়তো বুঝেছিলেন যে এখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। তবে গালাগালিতে কোন ত্রুটি ছিল না।

আমাকে যা খুশি বলুন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু দাদার ওপরে তাঁর উৎপাত মাত্রা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। নিরীহ দাদা প্রতিবাদ করত না, ঘরের কোনে লুকিয়ে চোখের জল ফেলত। বাবাকে বলে কোন লাভ হবে না জানতুম—তিনি মা-কে একটা কথাও বলতে সাহস পাবেন না। তাই ঠিক করলুম দাদাকে আমি রক্ষা করব। আমরা দু'জন ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই—বারো বছর বয়সের সময়েই এই সত্যটা আমার মনের কাছে ধরা দিয়েছিল।

বুলা একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

—যে বয়েসে মেয়েরা প্রজাপতির মতো খেলা করে বেড়ায়, সেই বয়সেই মনের ভেতর আমি গম্ভীর আর অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলুম। মনে হয়েছিল মা বেঁচে থাকলে যা করতেন, তাই আমাকেও করতে হবে। দাদাকে বাঁচাতে হবে যেমন করে হোক।

তারপর চরম কাণ্ড হল একদিন।

দাদা ম্যাট্রিক দেবে—ক'দিন বাদেই তার পরীক্ষা। ভালো ছাত্র—সিনিয়ার স্কলারসিপ পাওয়ার আশা রাখে। সন্ধ্যেবেলা সবে পড়তে বসেছে, এমন সময় নতুন মা এসে ফরমাস করলেন, তাঁকে তখুনি বাপের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে—ব্যারাকপুর।

শান্ত, ভালো মানুষ দাদারও সহ্য হল না। আপত্তি করলে।

নতুন মা-র চোখে আগুন ধরল। বাবার কুকুর মারা চাবুকটা এনে দাদার পিঠের ওপর চালাতে আরম্ভ করলেন হিংস্রভাবে। পনেরো ষোলো বছরের ছেলের গায়ে কেউ ও ভাবে হাত চালাতে পারে, অন্তত কোনো মেয়ে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। দাদা দু'হাতে মুখ গুঁজে চোরের মার সহ্য করতে লাগল।

কিন্তু আমি সইতে পারলুম না। আমার রক্ত অত ঠাণ্ডা নয়। দাদার টেবিল থেকে একটা কাচের ফুলদানি তুলে আমি নতুন মার দিকে ছুড়ে দিলুম। দু-হাতে কপাল চেপে বসে পড়ল নতুন মা—রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল আঙুলের ফাঁকে।

ভেবেছিলুম, বাবা ফিরে এলে অনেক দুর্গতি আছে অদৃষ্টে। কিন্তু আশ্চর্য কিছুই ঘটল না। নতুন মা নিজেই বোধ হয় সমস্ত জিনিষটাকে চাপা দিয়েছিলেন।

আর সেই থেকেই নতুন মা আমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিলেন।

আমি বুঝেছিলুম, যা করবার আমাকেই করতে হবে। সেই থেকে বাঘিনীর মতো পাহারা দিয়েছি দাদাকে। নতুন মার চোখ অক্ষম হিংসায় ধক্ ধক্ করেছে আমার দিকে তাকিয়ে, প্রত্যেক দিন আমার মৃত্যু কামনা করেছেন হয়তো। কিন্তু দাদার গায়ে কখনো হাত তোলবার সাহস পাননি আর।

বুলা সম্পর্কে রহস্যের পর্দাটা সরে গেছে চোখের সামনে থেকে। অনেকগুলো সংশয়ের সমাধান হয়ে গেছে। খুলে যাচ্ছে কতগুলো জট—যেগুলো অশোককে পীড়ন করছিল অনবরত।

বুলা বললে, সেই থেকে আজও আমি দাদাকে রক্ষা করে আসছি। জানেন, বাবা যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন আমি নিজে অ্যাটর্ণি ডাকিয়ে বাবাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিয়েছিলুম। আমি জানি—এ সব কথা শুনে আমার ওপরে হয়তো আপনার—কিন্তু এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার—দাদাকে বাঁচানোর কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাইনি সেদিন।

বুলার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন। উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে গাল।

—আজও আমার দাদাকে পাহারা দিতে হয়। আজো কোনো মেয়ে দাদার কাছাকাছি এলে আমি তার দিকে সন্দেহের চোখ মেলে তাকাই। নতুন মা এখন শান্ত আর নিরুপায় হয়ে গেছেন, তিনি জানেন আজ তাঁর দু-মুঠো খাবার সংস্থানও আমাদেরই হাতে। কিন্তু

তাঁর মতো অন্য মেয়ের তো অভাব নেই সংসারে। আমার নিরীহ ভালোমানুষ দাদাকে নির্যাতন করবার জন্যে কোথায় যে কে তৈরি হয়ে আছে—কে বলতে পারে। তাই—

বুলা হঠাৎ চুপ করে গেল। চেপে ধরল অশোকের হাত।

—অশোকবাবু, কতদিন দাদাকে পাহারা দেব আমি? কবে আমার মুক্তি?

—আপনি নিজে মুক্তি নিলেই মুক্তি। অনুপম বাবু এখন বড় হয়ে গেছেন, ওঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই।

—না-না, আপনি জানেন না! দাদা যে কত দুর্ব্বল, অসহায়—বলতে বলতে বুলা হাত সরিয়ে নিলে। অনুপম আসছিল।

এই ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কথাগুলো ভাবছিল অশোক। বুলার মনে সামনের পাহাড়ের মতো আলো আর কুয়াশার দ্বন্দ্ব। কী বিচিত্র জটিলতার ভিতরে বাস করছে সে। সেখান থেকে নিজেও বেরিয়ে আসতে পারবে না কোনোদিন—অনুপমকেও কি কোনোদিন মুক্তি দিতে পারবে?

বেলা ডুবে এসেছে—সন্ধ্যা নামছে গাছের মাথায় মাথায়। অশোক উঠে পড়ল। পাহাড়ী পথের বাঁক ঘুরতে হঠাৎ চমকে দাঁড়ালো সে।

ওপরের ছোট রাস্তাটা দিয়ে কারা উঠে আসছে? অনুপম আর বুলা?

না। অনুপম আর রুচিরা। সেই দীর্ঘ, শীর্ণ, অস্বাভাবিক শুভ্র শরীর। রুচিরা ছাড়া কেউ হতেই পারে না।

অশোকের পা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুলা কি জানে? অসম্ভব। আর সেদিনের সেই ঘটনার পরেও কি—

আবছা অন্ধকারে গাছের আড়ালে রুচি আর অনুপম হারিয়ে গেল। খানিকটা ভ্রুকুটি ফুটে উঠল অশোকের কপালে। ছাউনি হিলের উপন্যাস শুরু হয়েছে? না—সারা হয়ে এল?

অশোক দাঁড়িয়েই রইল।

আট

আবার দু'দিন কারো কোনো খবর নেই। শান্ত, নিরুত্তাপ—ছাউনি-হিল। বুলা-অনুপমের কোনো সন্ধানই নেই, ওরা যেন এখান থেকে মুছে গেছে। সরোজ আর চ্যাটার্জি গেছে জঙ্গল ইন্‌স্‌পেক্‌শনে। ডাক্তার হয়তো সাইলিকে বাঁচাবার অসম্ভব দুরাশায় তপস্যা করছে। অশোকের নিঃসঙ্গ দিন। উপন্যাসের খসড়াটাই করে ফেলবে নাকি ?

একগাদা চিঠিপত্র আছে কৌশিক রুচির নামে। ওঁদের চাকরটাও নিতে আসেনি। সারা দিনের ক্লান্ত মনটাও কোথাও নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। বারো নম্বর বাংলোর কাগজ আর চিঠিপত্র নিয়ে সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে পড়ল অশোক।

যথানিয়মে দ্বারপ্রান্তে বেবি-ডেভির অভ্যর্থনা। কৌশিক ঘোষের ডাক শোনা গেল : কে ?

—আমি অশোক।

—এসো, ভেতরে এসো।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে অশোক স্তব্ধ হয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, অনুপম বসে আছে! একটু দূরেই আর একটা চেয়ারে বসে আছে রুচি, তার শাদা কুৎসিত মুখখানাকে ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় একটা কঙ্কালের মুখের মতোই দেখাচ্ছে যেন। কৌশিক ঘোষ পাইপ টেনে চলেছেন—মাথার ওপর কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ধোঁয়ার রাশ।

অনুপম একবার অশোকের দিকে তাকালো—কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলো না। নিজে কী একটা বলছিল এতক্ষণ, তারই জের টেনে চলল।

—আমার বোনকে ম্যানিয়াক্‌ই বলতে পারেন। কী যে ওর

মাথায় ঢুকেছে—আমার নাকি একটি মাদাম কুরী ছাড়া চলবে না। সেই অদ্বিতীয়াকে যতক্ষণ খুঁজে না পাই, ততক্ষণ অতি সাবধানে থাকতে হবে আমাকে। এমন কি—

বাধা এল রুচির কাছ থেকে।

—ও কথা থাক অনুপমবাবু। আমরা জানতাম না। না বুঝে আপনার অনেক অসুবিধেই হয়তো করে ফেলেছি।

—কিছুই অসুবিধে করেননি। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনেকগুলো দুর্মূল্য গাছপালার সন্ধান আপনি আমাকে দিয়েছেন, যার খোঁজ কারো থেকেই আমি পেতুম না।

আশ্চর্য দুঃসাহসী হয়ে উঠছে অনুপম, অশোক ভাবল। দার্জিলিঙের বটানিক্‌স্ মনে পড়ল তার। বুলার পাগ্‌লামি? না অনুপমের অকৃতজ্ঞতা?

জীবনটা কী জটিল—কী অপূর্ব তার এক একটা অধ্যায়!

রুচি ক্লান্ত ভাবে বললে, আমাদের এখানে না আসাই বোধ হয় আপনার ভালো।

—আসব না? কেন আসব না?—অনুপমের চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল: আমি কি দুগ্ধপোষ্য? আমার বোন কি আমার গার্ডিয়ান? এখন দেখছি ওকে সঙ্গে এনেই আমার ভুল হয়েছে।

—আপনি না আনলেও কি উনি আসতেন না?—হঠাৎ কথাটা ছুড়ে দেবার লোভটাকে কোনো মতেই সামলাতে পারল না অশোক। একটা তিক্ত জ্বালা ছিল নিজের মধ্যে, সেইটেই যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে। কেমন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হল অনুপমকে। সে আর বুলার মাঝখানে অনুপমই তো দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মতো। নইলে তার এত কাছে এসেও এত দূরে থাকত না বুলা—নইলে নিজের জালে এমন করে ছটফট করতে হত না বুলাকে। অনুপম। সব কিছুর জন্যেই অনুপম দায়ী।

কিন্তু বলেই লজ্জা পেল অশোক। ভারী নগ্ন হয়ে কথাটা আঘাত করল তাকে। অনুপম বুঝতে পারল না।

—যা বলেছেন। কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না আমাকে। সব সময়ে যেন আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে চায়। এ এক ধরণের ইন্‌স্যানিটি—কী বলেন ?

অশোক জবাব দিল না। বিদ্রোহ ? অকৃতজ্ঞতা ? অনুপমের ওপর সত্যিই কি রাগ করা চলে ?

রুচি বিমর্ষ হয়ে বললে, তা হোক। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কোনো ভুল বোঝবার সম্ভাবনা ঘটতে না দিলেই ভালো করবেন অনুপমবাবু।

কৌশিক চুপ করে ছিলেন, চুপ করেই রইলেন। যেন এ-আলোচনার মধ্যে থেকেও নেই তিনি। উদাস আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বইয়ের শেল্‌ফের আশে-পাশে রাশি রাশি ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। কী দেখছেন তিনিই জানেন, কী ভাবছেন তিনিই বলতে পারেন। অশোকের মনে হল, এই কয় দিনেই যেন বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছেন দাদু—শুধু শরীরে নয়—মনেও। হয়তো এঁর পরে ঠাট্টা করেও ওঁকে আর তারুণ্যের অগ্রদূত বলা যাবে না—বলা যাবে না ওর মনে নিঃশেষ রসের ঝর্ণা বইছে।

অনুপম বললে, দাদু, রুচি দেবী, অশোকবাবু—আপনাদের সকলকেই বলছি। কাল বিকেলে আমাদের ওখানে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আপনাদের ওখানে!—রুচি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। বিহ্বল রুচির দিকে তাকিয়ে অশোকের করুণা হল।

অনুপম কঠিন হয়ে বললে, হাঁ, আমাদের ওখানেই। বুলার ব্যবহার দিনের পর দিন অসহ্য হয়ে উঠছে আমার কাছে। এর একটা প্রতিবাদ দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

কৌশিক কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তৎক্ষণাৎ ডেভি-বেবির ডাক শোনা গেল আবার। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় অশোক চমকে উঠল।

এবং, সে আশঙ্কা মিথ্যে হলনা। বাইরে চটির আওয়াজ পাওয়া

গেল। মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো, গায়ে ফিকে-নীল ওভার-কোট, হাতে টর্চ। বুলা! আজ একা এসেছে। এই অন্ধকারে, একা, প্রায় দেড়মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে তার ভয় করেনি!

রুচির চোখের দিকে তাকিয়ে কারো কিছু বলবার ছিল না। কৌশিক ঘোষের হাত থেকে পাইপটা কার্পেটের ওপর খসে পড়ল, অশোক জমে গেল চেয়ারটার মধ্যে, আরো শাদা হয়ে গেল রুচির কাগজের মতো শাদা মুখখানা।

বুলা বললে, দাদা!

অনুপম বিদ্রোহীর মতো চোখ তুলল।

—কী হয়েছে? অমন ছুটে এসেছিস কেন?

বুলা বজ্রভরা গলায় বললে, এমন করে এখানে পালিয়ে এলে কেন? আমাকে বলে এলেই তো হত। লুকোচুরি করার তো কোনো দরকার ছিল না।

মুখে যথাসাধ্য সাহস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে অনুপম বললে, লুকোচুরির কী দরকার আছে? আমি যেখানে যখন খুশি যাব। তারজন্যে কি সব সময়ে তোর পারমিশন নিয়ে আসতে হবে? তুই কি আমার গার্ডিয়ান টিউটর?

রুচি আর্তস্বরে বললে, অনুপমবাবু, আপনি বাড়ী যান।

—সেই ভালো—অস্পষ্ট স্বরে আওড়ালেন কৌশিক।

বুলা কান দিলে না। রুচির মুখের ওপর এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করে বললে, দাদা, তোমার টেস্ট্ যে এর চাইতে অনেক ভালো—এম্‌নি একটা ধারণা আমার এতদিন ছিল।

—বুলা!

একটা সুতীক্ষ্ণ অর্থহীন জ্বালা চমকে গেল অশোকের সর্বাঙ্গে। বাড়াবাড়ি—অসহ্য বাড়াবাড়ি, কেন অনুপমের জন্যে সে এমন করে ক্ষেপে উঠেছে? কেন রাতদিন এই নির্বোধ পাহারাদারী? তার ঈর্ষা জর্জরিত নিরুপায় ক্রোধ বুলার ওপরেই ফেটে পড়তে চাইল।

—বুলা দেবী, আপনার নিজের টেস্টের কথাও একবার ভেবে দেখবেন। আমরাও আশা করেছিলাম যে, কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে এর চেয়ে বেশি সংযমের পরিচয় আপনি দেবেন।

—শাট্ আপ্!—প্রেতিনীর মতো তীক্ষ্ণ গলায় বুলা অমানুষিক চীৎকার করে উঠল: কতগুলো পাহাড়ী জংলা—না আছে ডিসেন্সি—না আছে কাল্চার! এখানে আসাই আমাদের অন্যায় হয়েছে। দাদা—তুমি উঠবে কিনা?

বুলার সমস্ত মুখে সেই আদিমতা। বটানিক্সের বুলা নয়—যে বুলা টুকরো করে ছিঁড়েছিল সানাই ফুলটাকে।

—অনুপমবাবু আপনি যান—রুচি কাঁপতে লাগল থর থর করে।

—অনুপম বললে, আমি যাব না। রুচি দেবীর কাছে সিটিং দেব আমি—উনি আমার একটা পোর্ট্রেট্ আঁকবেন।

—দাদা!

রুচি বললে, না—না, দোহাই আপনার, আপনি যান। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি অনুপমবাবু—মিথ্যে শাস্তি আমাদের আর দেবেন না।

বুলা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ভয়াবহ আসন্নতা তার সারা শরীরে উগ্র হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে যা হোক কিছু একটা সে করে বসতে পারে। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে অশোক উঠে দাঁড়াতে গেল।

আর তখনি বাইরে ডেভি-বেবি আবার চীৎকার তুলল। শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। নেপালী চাকরটা বললে, না—যেতে দেব না।

—আমরা যাবই।—চার-পাঁচটি পাহাড়ী মানুষের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ভেসে এল বাতাস কাঁপিয়ে।

ঘরের এই কুৎসিত ক্লেদাক্ত নাটকটাকে শেষ করে দেবার জন্যেই যেন কৌশিক ঘোষ বললেন, কী চায় ওরা দল বাহাদুর! আসতে দে ওদের—

বুলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তিন-চারজন পাহাড়ী ঢুকল ঘরের মধ্যে। সকলের আগে একজন বুড়ো মতন ভুটিয়া। তার কোলে কম্বলে জড়ানো একটি শিশু।

—মানে বাহাদুর!—কৌশিক আর্তনাদ করলেন।

মানে বাহাদুর বললে, হাঁ আমি। আসতাম না—দায়ে পড়ে আসতে হল। আজ একবছর তুমি খরচা দাও না ঘোষ সাহেব—কোন খবরও রাখো না। রূপকুমারী রাস্তার পাথর ভেঙে তার ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছে দেড় বছর। কিন্তু কাল সে মারা গেছে। এখন তোমার ছেলেকে কে দেখবে ঘোষ সাহেব? তুমি একে নাও—। রাখতে চাও রাখো, নইলে ফেলে দাও ঝোরার জলে!

অনুপম উঠে দাঁড়িয়েছে—রুচি কাঠ হয়ে গেছে—অশোকের যেন দম আটকে আসছে। এমন কি বুলার পর্যন্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করবার সাহস নেই।

তবুও শেষ পর্যন্ত অশোকই ঘোর ভাঙল।

—কী পাগলের মতো বকছ মানে বাহাদুর? কার ছেলে?

—কার আবার? ওই ঘোষ সাহেবের। আমাদের বস্তিতে রূপকুমারীর কাছে আসত যেত—বিয়ে করেছিল কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে। তারপর বাচ্চা হল, দু' ছ মাস টাকা দিয়ে আর দেয় না। কাল রূপকুমারী মারা গেছে। এখন—

অশোক বোবা ধরা গলায় বললে, অসম্ভব!

—ঘোষ সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করুন ডাক বাবু। উনি বলুন, এ ওঁর বাচ্চা নয়? বলুন, ধরম সাক্ষী করে আমাদের সামনে রূপকুমারীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেননি?—মানে বাহাদুরের চোখ পাহাড়ের হিংস্রতায় দপ দপ করে উঠলো: অস্বীকার করুক ঘোষ সাহেব!

রুচি ভাঙা গলায় ডাকলো: বাবা!

কৌশিক দুহাতে মুখ ঢেকে সোফায় এলিয়ে পড়লেন। একটা কথাও বললেন না।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রুচি, যেন নিয়তির জন্য প্রতীক্ষা করল, তারপর নিজেই এগিয়ে এল মানে বাহাদুরের দিকে।

—দাও মানে বাহাদুর। আমার ভাইকে আমি মানুষ করব।

আর তৎক্ষণাৎ বুলার হিংস্র হাসি একরাশ সাপের মতো ঘরের মধ্যে কিলবিল করে ছড়িয়ে পড়ল।

—চমৎকার! সুপার্ব! দাদা—সিটিং দেবে না এখানে?

অশোকের ইচ্ছে হচ্ছিল সে দু'হাতে বুলার গলা টিপে ধরে। দু'চোখে আগুন জ্বেলে সে বুলার দিকে তাকালো।

কিন্তু অনুপম ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—না, এখানে থাকার সত্যিই আর কোনো মানে হয় না। চল্—

পরদিন সকালেই অনুপম আর বুলা ছাউনি-হিল ছেড়ে চলে গেল। যাবেই—অশোক জানত। এর পরে এখানে আর একদিনও থাকা সম্ভব ছিলনা ওদের।

শুধ্ একটুখানি ঘটনা ঘটল গাড়ীটা চলে যাওয়ার আগে। পোস্ট্ অফিসের সামনে পথের ধারে সে দাঁড়িয়েছিল, গাড়ীটা এসে থামল তার পাশেই, বুলা ডাকল: অশোকবাবু।

—বলুন।

—কাছে আসুন একটু।

অশোক কাছে এগিয়ে গেল। সকালের রোদ পড়েছে বুলার মুখে। সেই প্রথম দিনটির মতোই সূর্যের সোনা এসে ঝরেছে তার গালে কপালে। অশোকের ইচ্ছে করল, আবার কোথা থেকে একগুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে এনে বুলার হাতে দেয় সে।

বুলার চোখ চকচক করছিল। চাপা-গলায় বললে, অশোকবাবু!

—বলুন।

—আমাকে ক্ষমা করবেন।

—ক্ষমা করবার কিছু নেই।

—লামার মন্দিরের সেই ঘণ্টার আওয়াজটা আমার বড় ভালো লেগেছিল। আর দার্জিলিঙের দিনটা।

অশোক বললে, তা জানি।

—আপনার মনে থাকবে সে কথা ?

—হয়তো থাকবে। কিন্তু আপনার থাকবে না।

বুলার দৃষ্টি জ্বলে উঠল ঃ এ কথা কেন বললেন ?

—ঠিক জানি না। আপনিও জানেন না। কেউই জানে না। তবু ওই ঘণ্টার আওয়াজটা আপনি ভুলে যাবেন—এটা নিশ্চয়। বটানিক্‌সের স্মৃতিও মুছে যাবে। বড় জোর মনে থাকবে, একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছিল, ঘটলনা।

—সব মনে থাকবে, সব। কিছু ভুলব না—দেখে নেবেন।

—বেশ, অপেক্ষা করব।—অশোক মৃদু হাসল ঃ কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেবেন আমাকে ?

—দেব, নিশ্চয় দেব।—বুলা আবার বললে ফিস্‌ফিস্‌ করে।

গাড়ীর ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে নিল বুলা ধীরে ধীরে। একখানা হাত রাখল জানলায়, মৃদু স্পর্শ করল অশোক। গাড়ী স্টার্ট নিলে, তারপর এগিয়ে চলল দার্জিলিঙের দিকে। ছাউনি-হিল ওদের জায়গা দিতে পারল না। ·

শুধু অনুপমের গলা শোনা গেল একবার ঃ আসি অশোক বাবু নমস্কার—

প্রতি নমস্কারের সময় ছিলনা, প্রয়োজনও না। একটু পরেই পাইন বনের বাঁকে মোটর অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু ভিজে ধুলোর গন্ধ কিছুক্ষণ ছড়িয়ে রইল চারদিকে।

বুলা চিঠি লিখবে না—অশোক জানে। লামার মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ যদি কোনো অলস অবসরে তার কানে বেজেও ওঠে, তবে তা মুহূর্ত-বিলাসের বেশী নয়। এক মিনিটের মধ্যেই বুলা তা ভুলে যাবে।

আশ্চর্য জীবন—তার জটিলতা! নিজের কাছ থেকে মুক্তি চায়

বুলা; কিন্তু সে মুক্তি আসবে কোন পথে? কোন্ নিষ্ঠুর আঘাত তার নিজের বোনা জালটা ছিঁড়ে উদ্ধার করবে তাকে?

অশোক আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রোদ আর কুয়াশার লুকোচুরি চলেছে। চোখে পড়ল—বগলে কী কতগুলো নিয়ে পাহাড়ী বস্তির দিকে চলেছে ডাক্তার। অত্যন্ত ব্যস্ত—যেন জরুরি কোনো কাজে ছুটে চলেছে।

—মিস্ আলেয়া!—একবার স্বগতোক্তি করলে অশোক। তবু এখনো আশা রাখে ডাক্তার—এখনো মিরাক্‌লের ভরসা আছে ওর। বাঁচবে না, তবু বাঁচতে পারে। টু ইয়ং।—টু গুড্। এত তাড়াতাড়ি মরতে পারে না—মরা চলে না ওর। তাই বটে।

আর একবার থেমে গেল অশোক।

পাশেই পাহাড়ের একটা টিলা। সেই টিলার ওপর মূর্তির মতো একটি মেয়ে। যেন শুভ্র একরাশ কুয়াশার মধ্য থেকে এই মুহূর্তেই ওখানে জন্ম নিয়েছে মেয়েটি।

রুচি! রুচিরা!

কুয়াশা কেটে গিয়ে আবার সূর্যের আলো পড়েছে মেয়েটির ওপর। মুহূর্তের জন্যে মনে হল—এই পাহাড়ের নিঃসঙ্গ আত্মার মত সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ওই রুচিরাই। কোথাও নেই সে—তার কোনো অস্তিত্বই নেই যেন। কাল রাত্রে যা ঘটে গেছে, তারপরে আর কোথাও কোনো ভিত্তি নেই তার। কৌশিক ঘোষের পাপের লজ্জা নীল-কণ্ঠের মতো রুচিকেই পান করতে হয়েছে আকণ্ঠ।

অশোক দাঁড়িয়ে রইল। এত কাছে—অথচ রুচি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজের মধ্যে একটা অতল যন্ত্রণার সমুদ্রে যেন সে তমসা-স্নান করছে।

অশোক তো কতবার—কতদিন রুচিকে দেখেছে। কিন্তু আজ মনে হল—কেন কে জানে মনে হলঃ এই মেয়েটিকেও আবিষ্কার করা চলে, হয়তো এর মধ্যেও কোথাও কোনো পরম দুর্লভ লুকিয়ে

আছে। রুচির সমস্ত কুশ্রীতার আড়ালেও কি অনুপম তার সন্ধান পেয়েছিল?

অশোক ধীরে ধীরে টিলার ওপর উঠল। ডাকল: রুচি দেবী।

রুচি চমকালো না—ফিরে তাকালো। তার চোখে তখনো তমসা স্নানের কৃষ্ণতা। সে তাকিয়ে আছে—অথচ দেখতে পাচ্ছে না।

সামনে ইজেলের ওপর একটা ল্যাণ্ডস্কেপ্। কিন্তু রুচি সেটা শেষ করেনি। তার আগেই কী খেয়ালে একরাশ লাল-কালো রঙের আঁচড় টেনে তাকে বিকৃত করে দিয়েছে।

অশোক সস্নেহে বললে, ছবিটা নষ্ট করলেন কেন? আবার শুরু করুন।

রুচির ঠোঁট কাঁপতে লাগল। জল টলমল করতে লাগল চোখের কোণে। সকালের আলোয় ছুটি সোনালি বিন্দুর মতো মনে হল অশ্রুকণা ছুটো।

অশোক গভীর গলায় বললে, অনেকবারই নতুন করে শুরু করা যায়। শুরুর শেষ কোথাও নেই। ডাক্তারের মুখখানা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল: টু গুড্—টু ইয়ং।

অশোক বললে, ছবিটা নষ্ট করবেন না। একটা ছবি আঁকতে অনেক পরিশ্রম দরকার—দরকার অনেক সাধনা।

রুচি তাকিয়ে রইল অশোকের দিকে। অনেকক্ষণ।

"Sont remplies de rayons !"

সূর্যের নিসংকোচ আলোয় সমস্ত ছাউনি-হিল ধীরে ধীরে আকাশপর্ণী ফুলের মতো ফুটে উঠল॥

